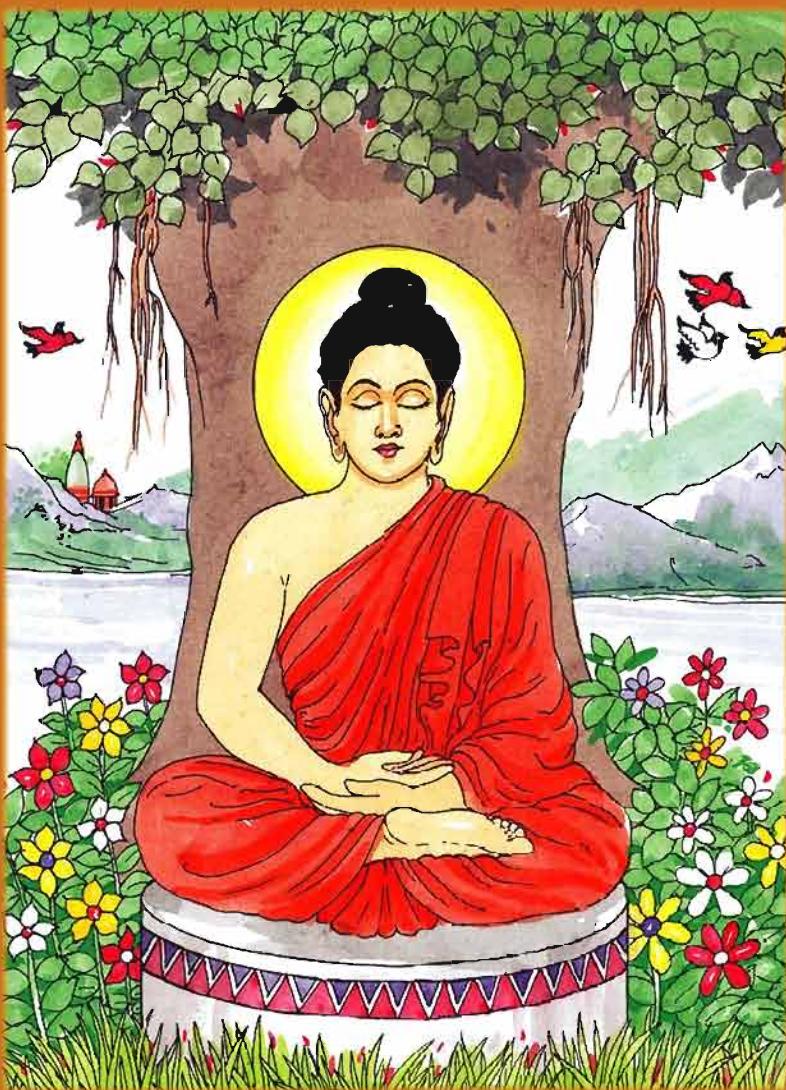


বৈদ্যধর্ম ও নেতৃত্ব শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩
শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপন্থকরণে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া

শ্রীমৎ ধর্মরাক্ষিত মহাথের

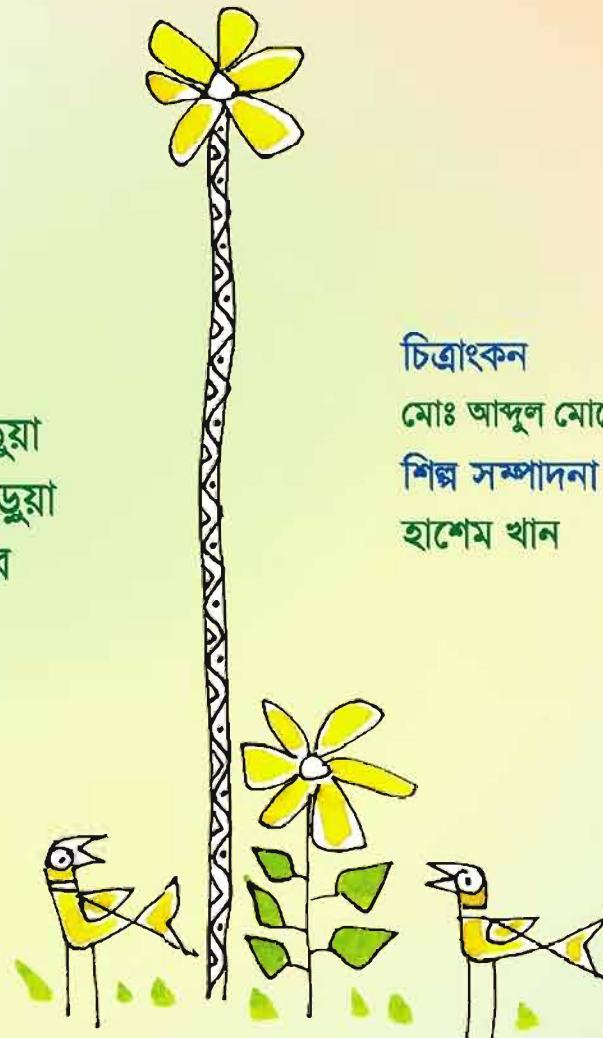
জগন্নাথ বড়ুয়া

চিত্রাংকন

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : , ২০১২

সমন্বয়ক

মোঃ আবু সালেক খান

**গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার দাস**

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

**তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির তাওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য**

মুদ্রণে :

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	কৃদন্তা ও নিত্যকর্ম	১০-১৫
তৃতীয় অধ্যায়	পূজা ও দান	১৬-২৪
চতুর্থ অধ্যায়	শ্রামণ্য শীল	২৫-৩১
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : অভিধর্ম পিটক	৩২-৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	কর্ম ও কর্মফল	৩৮-৪৪
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য	৪৫-৫৫
অষ্টম অধ্যায়	জাতকের শিক্ষা	৫৬-৭০
নবম অধ্যায়	ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দর্শন	৭১-৮৫
দশম অধ্যায়	ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান	৮৬-৯৪
একাদশ অধ্যায়	ধর্ম ও ঋদেশপ্রেম	৯৫-১০৩
দ্বাদশ অধ্যায়	পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস	১০৪-১০৯

প্রসঞ্চকথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিঅয়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অভ্যন্তর নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশু-বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য পাইতঙ্গন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভবছেন। তাদের সেই বিশুল ভাবনানিচমের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অঙ্গরিহিত অপার বিঅয়বোধ, অসীম কৌতুহল, অব্যৱস্থিত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুস্থ বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাকৰ্ম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাকৰ্মে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্বিনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অঙ্গরিহিত তাংগর্ঘকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়তান্ত্রিক প্রাণিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়তান্ত্রিক অর্জন উপর্যোগী যোগ্যতা ও পরিশেবে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চ সম্মতীমায় শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিচেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাকৰ্মের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রশীত পাঠ্যপুস্তকে যত্ন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় প্রেসির ‘বৌদ্ধধর্ম ও নেতৃত্বিক শিক্ষা’ ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে একটি নতুন সংযোজন। বিশেষ করে বুদ্ধবাদীর মূলশিক্ষা নেতৃত্বিক বৈশিষ্ট্য এতে প্রাথমিক লাভ পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণে গুণান্বিত ও বিকশিত হয়ে ভাবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও জনস্তুষি বালাদেশের উন্নয়নে এসিয়ে আসুক - টেই আমাদের একান্ত কামনা।

বৌদ্ধধর্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম গধ্যাম। এতে শিশু চিত্তে ধর্মীয় বৌধ জ্ঞান হয়। এ প্রেক্ষাপটে সেবকবৃদ্ধও এ পাঠ্যপুস্তক রচনায় অধ্যয়তান্ত্রিক মূলগাঠকে স্বজ্ঞ পরিসরে ও সহজভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে বুদ্ধের জীবনী, শীল (নেতৃত্বিক শিক্ষা), তীর্থস্থান, জাতকের গল্প প্রভৃতি উপদেশমূলক তথ্য এবং পাঠ্যতান্ত্রিক চিত্র শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বেশি।

শিক্ষাকৰ্ম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। লক্ষণ্য যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আবরণ আঁচাই ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঞ্জে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঞ্জের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাকৰ্মের আলোকে প্রায়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বালানের ক্ষেত্রে সমতা বিশানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাস্তু একাডেমী কর্তৃক প্রশীত বানানীতি।

সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গের সহজ প্রয়াস ও সর্তকতা থাকা সম্ভেদ পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ছুটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করা হলে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করব।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্মাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে হাঁয়া সহায়তা করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক কৃতসজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাকৰ্ম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।



প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ



আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন শুন্ধেদন। রানির নাম ছিল মহামায়া। মহামায়া এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বনী উদ্যানে উপস্থিত হলেন। এমন সময় রানি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বহুদিন পর রাজা-রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। জন্মের সাতদিন পর মাতা মায়াদেবী মারা যান। বিমাতা মহাপঞ্জাপতি গৌতমী কর্তৃক শালিত পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় গৌতম। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করায় অমাত্য ও প্রজাগণ নাম রাখলেন শাক্যানিংহ।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েই সাত পা হেঁটে
সামনে গেলেন। সাত পায়ের নিচে
সাতটি পদ্ম ফুটল। সপ্ত পদ্মে দাঁড়িয়ে
উচ্চ কঢ়ে বললেন – ‘জগতে আমিই
জ্যেষ্ঠ; আমিই শ্রেষ্ঠ’।

নবজাত শিশুটি দিন দিন বড় হতে
লাগল। তাঁর মাঝে চপলতা ছিল না। সব
সময় নির্জনে বসে বসে যেন কী
ভাবতেন। একদিন রাজা শুন্ধেদন
সিদ্ধার্থ গৌতমকে সৎগে নিয়ে হাল কর্ষণ
উৎসবে যান। হাল চাষের কারণে মাটির
ভেতর হতে অনেক পোকা-মাকড়
উঠছিল। বেঙ্গের সে পোকা-মাকড়
খাচ্ছিল। এদৃশ্য দেখে রাজকুমারের
মনে দুঃখ হলো। নিরীহ প্রাণির প্রতি
রাজকুমারের মন দুঃখে ভরে গেল।
মনে করুণা হলো। তখন রাজকুমার

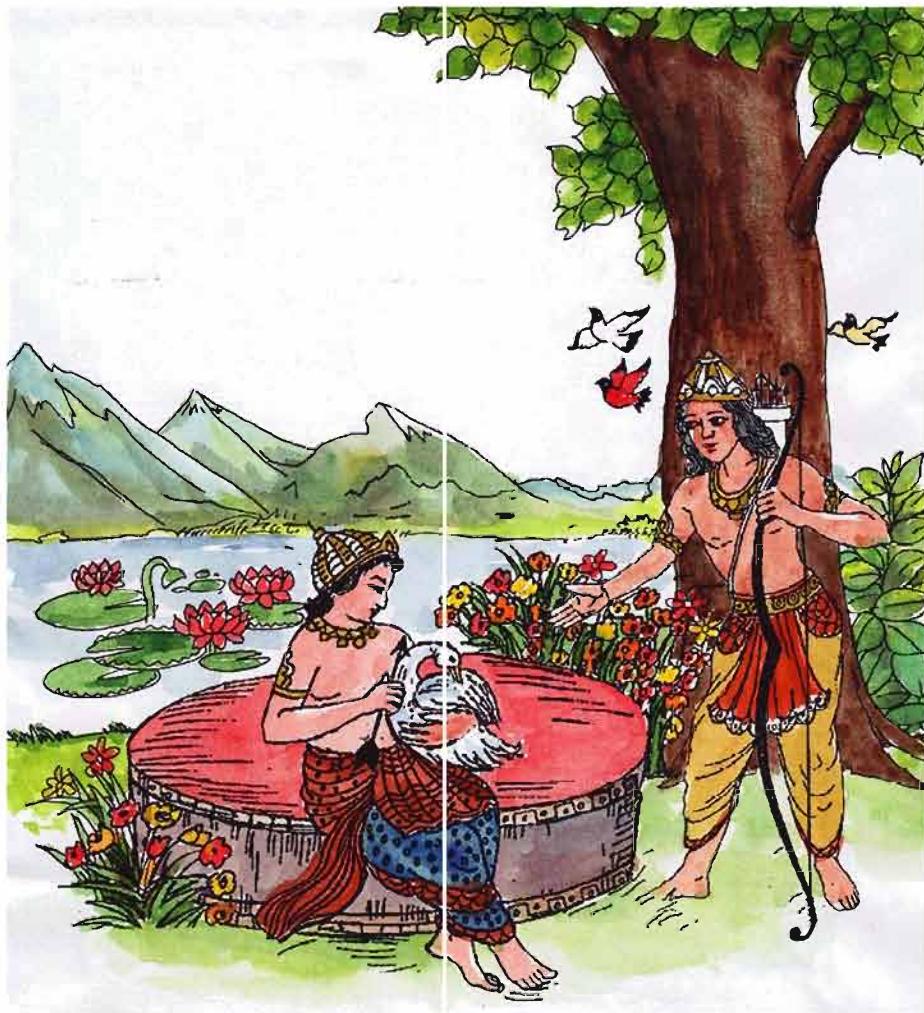


সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম

সিদ্ধার্থ জন্মবৃক্ষের নিচে বসে জীবের দুঃখের কথা ভাবছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম অন্য একদিন বিকেল বেলায় একটি ফুল বাগানে নিঝেনে বসে যেন কি ভাবছিলেন। এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে পড়ল। হাঁসটির বুকে একটি তীরবিদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম হাঁসের বুক হতে তীরটি খুললেন। হাঁসটিকে সুস্থ করলেন।

এমন সময় সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই দেবদত্ত তাঁর সামনে আসল। এসে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বলল, ‘হে সিদ্ধার্থ ! এ হাঁসটি আমার। হাঁসটি আমায় দিয়ে দাও।’ তখন গৌতম সিদ্ধার্থ বলল, ‘ভাই দেবদত্ত, তুমি। প্রাণহরণকারী, আমি প্রাণদাতা। আমি শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে রাজি আছি। তবুও এ হাঁসটি তোমায় দেব না।’ কুমার সিদ্ধার্থ একথা বলে হাঁসটিকে



সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে দেবদত্তের তীরবিদ্ধ আহত হাঁস

গৌতম বুদ্ধ

আকাশে উড়িয়ে দিলেন। হাঁসটি পাঁক পাঁক শব্দ করতে করতে আকাশে উড়ে গেল।

সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চৌষটি রকমের লিপি শিক্ষা করেন। ত্রিবেদসহ নানা শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অশ্বারোহণ, রথচালনা, ন্যায়শাস্ত্র, মৃতিশাস্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম কৈশোর কাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর উনিশ বছর বয়স হল। তিনি সব সময় নির্জনে বসে চিংস্তায় মঞ্চ থাকতেন। এজন্য রাজা শুদ্ধেদান সিদ্ধার্থ গৌতমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যশোধরা নাম্বী এক ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান। কিন্তু এতেও সিদ্ধার্থের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হল না। জীবের দুঃখ কীভাবে দূর করবেন, নৌরবে বসে ভাবতেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে সংগে নিয়ে চারদিন নগর ভ্রমণে বের হন। জরাগ্রস্থ, ব্যাধিগ্রস্থ, মৃতদেহ এবং একজন সন্ন্যাসী দেখলেন। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত হতে রক্ষার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণই উচিত মনে করলেন। তিনি আষাঢ়ি পূর্ণিমার দিনই গৃহত্যাগ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ি পূর্ণিমা তিথি। যশোধরা একটি পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম রাখা হয় রাহুল। যশোধরা গভীর রাতে নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে সোনার পালৎকে ঘূমাচ্ছেন। এ মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে ডাবলেন। কল্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনতে আদেশ দেন। সারথি ছন্দক অশ্ব সাজিয়ে আনল। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম যশোধরার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন। নবজাত শিশুকে এক ‘পলক দর্শন’ করে গৃহত্যাগ করলেন।

রাত পোহাল। সিদ্ধার্থ গৌতম ছন্দককে সংগে নিয়ে অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। অশ্ব হতে নেমে সিদ্ধার্থ গৌতম তলোয়ার ধ্বারা মাথার চুল কাটলেন। সে চুল আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম নিজ দেহ হতে সমস্ত রাজকীয় পোষাক খুলে ফেললেন। পোষাকগুলো ছন্দককে দিয়ে বিদায় দিলেন। ছন্দক কপিলবাস্তু নগরে ফিরে আসল। গৌতম সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ সকলকে জানাল। নগরবাসী গৃহত্যাগের কথা শুনে কাঁদল।

তারপর সিদ্ধার্থ গৌতম ঋষি আড়ার-কালামের আশ্রমে গেলেন। পরে রাজগৃহের ঋষি বুদ্ধক

রামপুত্রের আশ্রমে গমন করেন। উভয় স্থানে কিছুদিন সাধনা করেন। তাঁদের সাধন পথে সাধনার দ্বারা দৃঢ় মুক্তি সম্ভব নয় বুঝলেন। তাই এ দুজন ঋষিকে ত্যাগ করে নিজেই সাধনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম সাধনা করার উদ্দেশ্যে গয়ার অদূরে পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনাহারে শরীরের রক্ত মাধ্য শুকিয়ে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন সত্যকে জান করতে হলে আত্ম-নিশ্চহ এবং ভোগ বিলাসের পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে হবে।

দুর্বল দেহ নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম সেনানী নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। একটি বিশাল অশ্঵থ বৃক্ষের পোড়ায় আসন পেতে বসলেন। এমন সময় সেনানী গ্রামের কুশবধূ সুজাতা স্বর্ণ ধালায় পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে তুলে দিল।

সিদ্ধার্থ গৌতম
পায়সান্ন আহার
করে নৈরঞ্জনা
নদীতে স্নান
করেন। তারপর
উরুবিল্ল গ্রামে
গমন করেন।
সেখানে উন্নত
স্থানে একটি
বিশাল অশ্঵থ বৃক্ষ
ছিল। সে বৃক্ষের
নিচে পূর্বমুখি হয়ে



রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত

গৌতম বুদ্ধ



কঠোর সাধনারাত সিদ্ধার্থ গৌতম

বজ্জ্বাসনে বসলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী ‘পূর্ণিমা। তিনি বজ্জ্বাসনে বসে সংকল্প গ্রহণ করলেন—‘এ আসনে আমার রক্ত মাংস শুকিয়ে যাক। শরীর বিনষ্ট হলেও পরম বোধিজ্ঞান লাভ না করে এ আসন ছেড়ে উঠব না।’ এমন সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতি ধারণ করে সিদ্ধার্থের সামনে আসল। সহস্র হস্তে অঙ্গ নিয়ে গৌতম সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করল। তাঁকে লক্ষ্য করে উন্নত শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করল। কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম আসন ছেড়ে উঠলেন না। তখন পাপমতি মার আপন যুবতী কন্যা রাতি, আরতি ও তৃক্ষাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভজা করার আদেশ দিল। কিন্তু তিনি সাধনায় স্থির রইলেন।

পাপমতি মার ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধার্থের সামনে থেকে চলে গেল।

এদিকে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছিল। রাত্রির তৃতীয় ঘামে গৌতম সিদ্ধার্থ সব তৃষ্ণাক্ষয় করে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তিনি বুঝগেন তৃষ্ণাই জন্মের কারণ। আবার জন্মাই সকল দুঃখের মূল। তৃষ্ণার মূল ছেদন করতে পারলেই পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন, সে স্থানটি বুদ্ধগায়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন, আমি যে ধর্ম লাভ করেছি তা অতি গভীর ও দুর্বোধ্য। জ্ঞানীগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ এ ধর্ম বুঝবে না। এ কারণে ধর্ম প্রচার করবেন না বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। সে সময় সহস্রতি ব্রহ্মা প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান বুদ্ধ, আপনি ধর্ম প্রচার করুন। অনেকে আপনার সাধনালক্ষ্য ধর্ম বুঝবে।



বোধিবৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থকে মারের আক্রমণ

গৌতম বুদ্ধ

তখন ভগবান বুদ্ধ প্রথম কার নিকট ধর্ম প্রচার করবেন চিন্তা করলেন। তিনি প্রথম আড়ার-কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের নিকট ধর্ম প্রচার করার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তাই তিনি প্রথম জীবনের সংগী পঞ্চবর্ণীয় শিষ্যদের নিকট ধর্ম প্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। তিনি পঞ্চবর্ণীয় শিষ্য-কৌশিন্য, ভদ্রিয়, বশ্প, মহানাম ও অশ্বজিতের নিকট সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। তিনি শিষ্যদেরকে বললেন— ‘হে ভিক্ষুগণ, প্রবজিতদের জন্য সাধন পথে দুটি অন্তরায় পরিত্যাগ করা উচিত। আআপীড়ন না করা এবং অতি ভোগ বিলাসের পথ ত্যাগ করা।’ সাধনার জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সাধকদের কর্তব্য। সে মধ্যম পথ হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক সূতি ও সম্যক সমাধি। চতুর্বার্থ সত্যই জগতের প্রকৃত সত্য। তা উপলব্ধি করে সাধনা করাই সাধকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম সকল প্রাণির মঙ্গলের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্দে বিভক্ত।

বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে আয়ুষ্মান আনন্দাকে সৎগে নিয়ে কুশীনগর গমন করেন। মল্ল রাজাদের যমক শালমূলে উভর শিয়রে শয়ন করেন। এমন সময় দেবতাগণ বুদ্ধের উপর পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করেন। তখন বুদ্ধ আনন্দকে লক্ষ্য করে বললেন— ‘হে আনন্দ, পুষ্প বৃষ্টির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধকে পূজা করা হয় না। যে বুদ্ধের উপদেশ সুস্মানসুস্মতাবে নিজ জীবনে আচরণ করে এর দ্বারাই প্রকৃত বুদ্ধ পূজা হয়’।

ভগবান বুদ্ধ এরূপ উপদেশ প্রদান করে ধ্যানস্থ হন। প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যান হতে তৃতীয় ধ্যানে এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) টিক দাও :

১. হিমালয়ের পাশে কোন রাজ্য ছিল ?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. কপিলবাসু | খ. নালন্দা |
| গ. রাজগীর | ঘ. সারনাথ |

২. সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথম কোম বৃক্ষের মিঠে বসে ধ্যান করেন ?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. বটবৃক্ষ | খ. শালবৃক্ষ |
| গ. জম্বুবৃক্ষ | ঘ. চন্দনবৃক্ষ |

৩. সিদ্ধার্থ গৌতমের মামাতো ভাইয়ের নাম কী ছিল ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. আনন্দ | খ. সোমানন্দ |
| গ. ব্ৰহ্মদত্ত | ঘ. দেবদত্ত |

৪. সিদ্ধার্থ গৌতমের সারথির নাম কী ছিল ?

- | | |
|---------|-----------|
| ক. অলক | খ. ছন্দক |
| গ. পুলক | ঘ. খুদ্দক |

৫. সিদ্ধার্থ গৌতম কোন দিকে মুখ বরে বস্তাসনে বসেন ?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. পূর্বমুখী | খ. দক্ষিণ মুখী |
| গ. পশ্চিম মুখী | ঘ. উত্তর মুখী |

৬. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ বৃক্ষত্ব লাভ করে বৃদ্ধ হন।

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ক. বৈশাখী পূর্ণিমা | খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা |
| গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা | ঘ. মাঘী পূর্ণিমা |

গৌতম বুদ্ধ

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শিশুটি হয়েই সাত পা হেঁটে সামনে গেল।
২. এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে।
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত ছিলেন।
৪. দুঃখ কীভাবে দূর করবেন নীরবে বসে ভাবতেন।
৫. নবজাত শিশুকে এক পলক করে গৃহত্যাগ করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে	১. অশ্ব সাজিয়ে আনল।
২. তিনি সব সময় নির্জনে বসে	২. সৎবাদ সকলকে জানাল।
৩. সারথি ছন্দক	৩. রাত্রি মাঠস শুকিয়ে যাক।
৪. সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের	৪. করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন।
৫. এ আসনে আমার	৫. অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন।
৬. সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব তৃষ্ণাক্ষয়	৬. চিন্তা মগ্ন থাকতেন।
	৭. সফরে গেলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থের বাল্যকালে কী কী নাম ছিল ?
২. গৌতম সিদ্ধার্থ বুকে তীর বিদ্ধ হাঁসটিকে কী করলেন ?
৩. গৌতম সিদ্ধার্থ বাল্যকালে কোন বেগন বিদ্যা শিক্ষা করেন ?
৪. পাপমতি মার গৌতম সিদ্ধার্থকে কীভাবে আক্রমণ করল ?
৫. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখ ?
৬. বুদ্ধ পরিনির্বাণের সময় আনন্দকে উদ্দেশ্য করে কী উপদেশ দেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থের বাল্য জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা কর।
২. গৌতম সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের বর্ণনা দাও।
৩. সুজাতার পায়াসন্ন দানের বিবরণ দাও।
৪. গৌতম সিদ্ধার্থের বুদ্ধিত্ব লাভের ঘটনা বর্ণনা কর।
৫. বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসনা ও নিত্যকর্ম

বসনা অর্থ প্রণাম, স্তুতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বৌদ্ধদের নিকট ত্রিভূত পরম আধার বা আশ্রয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিভূত বলা হয়। ত্রিভূতকে প্রণাম করাই হচ্ছে ত্রিভূত বসনা। বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল-সম্ম্যা বসনা করে। অত্যেককে বৌদ্ধ বিহারে বা বাড়িতে নিয়মিত বসনা করতে পারে।

প্রতিদিন যথাসময়ে বসনা ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়। এগুলো নিত্যকর্ম। আবার যথাসময়ে ঘুম থেকে ঘোঁষা, হাত-মুখ ধোয়া, পড়ার টেবিলে বসা এগুলোও নিত্যকর্ম। এছাড়া ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পিতা-মাতাকে কাজে সাহায্য করাও তোমাদের কর্তব্য।

নিম্নে ত্রিভূত বসনা পাণি ও বাঞ্ছায় প্রদত্ত হচ্ছে—

পাণি

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে—
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্তা,
সম্বোধিমাগষ্ঠি অনন্ত এগানো—
লোকুভমো তৎ পণমামি বুদ্ধং।

বঙ্গানুবাদ

যেই লোকোভম অনন্ত জ্ঞানী সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বোধিমূলে অবস্থান করে মার সেনার সাথে যুদ্ধ করে মহান বিজয়ী হয়ে সম্বোধি শাত করেছিলেন, আমি সেই বুদ্ধকে প্রণাম করছি।

পাণি

অট্ঠঙ্গিকো অরিয়পথো জ্ঞানং—
মোক্তস্পৰ্বেসা যুজুকোব মগ্গো
ধন্মো অযং সন্তি করো পণীতো—
নীয়ানিকো তৎ পণমামি ধন্মং।

কৃদনা ও নিত্যকর্ম

বঙ্গানুবাদ

জনগণের অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট আর্যপথ, মোংক্ষ প্রবেশের সোজা রাস্তা স্বরূপ, শান্তিকর,
শ্রেষ্ঠধর্ম এবং যেই ধর্ম নির্বাণে নিয়ে যায়, তেই ধর্মকে আমি প্রণাম করছি।

পালি

সৎয়ো বিসুদ্ধো বর দক্ষিখণেয়—

সন্তি স্ত্রিযো সব্বমলশ্চহীণো,

গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিশ্চভো—

অনাসবো তৎ পণ্মামি সংঘৎ।



পিতা-মাতার সাথে ত্রিরত্ন কৃদন্তারত কিশোর-কিশোরী ও বালক-বালিকা

বঙ্গানুবাদ

যিনি বিশুদ্ধ সংঘ দান গ্রহণের উত্তমপাত্র, শাস্ত্রন্ত্রিয়, সকল প্রকার পাপমলবিহীন, অনেক প্রকার গুণভূষিত ও আশ্রব ক্ষয়কারী, আমি সে সংঘকে প্রণাম করছি।

প্রতিদিন যথাসময়ে যেই কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে নিত্যকর্ম বলে। প্রতিটি শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা তার নিত্যকর্ম সম্পাদন করবে। বয়স্করাও এই নিয়ম মেনে চলবে। পৃথিবীতে মাতা-পিতা হলেন পরম গুরু। মাতা-পিতা হলো পুত্র-কন্যার জন্ম দাতা। কিন্তু জ্ঞান দাতা হিসেবে শিক্ষাগুরুর আসন অনেক উপরে। শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীর মনের অংশকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বলে দেন। এজন্য মাতা-পিতার মত শিক্ষা গুরুর স্থানও অতি উপরে।

সংসারে মাতাপিতা ও শিক্ষাগুরু ব্যতিত আরো অনেক গুরুজন আছেন। লোক সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠগণ মাত্রই গুরুজন। এহেন গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে। এতে মানবিক গুণের বিকাশ হয়। গুরুদের প্রতি বিনম্র ভাব পোষণ করা উচিত। গুরুদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবে। সুন্দর ব্যবহারে গুরুদের নিকট আশীর্বাদ লাভ করা যায়। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে— গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শীলবান ব্যক্তিদেরকে অভিবাদন করবে। অভিবাদন করলে আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

গুরুদের গুণ বর্ণনা করা যায় না। এদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে নিজের জীবনের মৎগল হয়। এছাড়াও নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে।

প্রত্যেকেরই দায়িত্ববোধ থাকতে হয়। পরিবার ও সমাজের প্রতিও মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হয়। তাঁদের সুখে-দুঃখে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে। গুরুজনদের আদেশ উপদেশ মতে সংসারের কাজ সম্পাদন করতে হয়। পরিবারের ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা পোষণ করা কর্তব্য। তাদের লেখাপড়ার প্রতি যত্ন নেবে। সমাজের যে কোনো কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। সমাজে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজকে নিজের মনে করে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে বিপদে আপনে রক্ষা করতে হয়। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবে যোগদান করতে হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মৃতব্যক্তির দাহকার্য, বিবাহ কার্য অনুষ্ঠিত হয়। এসব উৎসব

ବନ୍ଦନା ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମ

ବ୍ୟତିତୋ ଆରୋ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣେର ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ରହେଛେ । ସେବ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବକେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହବେ । ସାଧ୍ୟମତ ଏବୁପ କାଜ ସମ୍ପାଦନେର ଜନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଓ ସମାଜେର ଉତ୍ସବକେ ସାଧିତ ହୁଏ ।

ଏକତାଇ ବଳ । ସଂଘେର ମିଳନ ସୁଖକର । ଏକତାବନ୍ଧ ହେଁ କାଜ କରବେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ମାନୁଷ ବୃଦ୍ଧତାର କାଜକେ ସହଜେ ସମାଧାନ କରତେ ପାରେ । ପରିବାରେ ଓ ସମାଜେ ଅନେକ କାଜ ଥାକେ । ଅନେକ ସମୟ ସବ କାଜ ଏକା କରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏକତାବନ୍ଧ ହେଁ କାଜ କରଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜଓ ସହଜେ ସମାଧାନ କରତେ ପାରା ଯାଏ । ଏଜନ୍ୟ ମାନୁଷ ଆଧୁନିକ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସମନ୍ବୟେ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ପରିବାର ଓ ସମାଜେ ବୃଦ୍ଧତାର କାଜ ସମ୍ପାଦନ କରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ସମବାୟ ସମିତିର ମାଧ୍ୟମେ ସମାଜେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅବଦାନ ରାଖିତେ ସକ୍ଷମ ହଚେ । ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ମାନୁଷଙ୍କ ଆଜ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହନେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକତାବନ୍ଧ ହେଁଥାଏ । ତାରା ପୃଥିବୀର ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଜଲଜନକ କାଜ କରିଛେ । ଏ କାରଣେ ପୃଥିବୀର ମାନୁଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିତେ ବସବାସ କରାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେଛେ । ସେ କାରଣେ ପାରିବାରିକ ଓ ସମାଜେର ସକଳ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ଏକତାବନ୍ଧ ହେଁଥାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଗଡ଼େ ତୁଳନାରେ ହେଁଥାଏ । ଏର ଫଳେ ନିଜେର ଓ ପରେର ହିତସାଧନ କରତେ ସକ୍ଷମ ହେଁଥାଏ ।

ମାନୁବ ଜୀବିତର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ୟ ଯୌଥ କର୍ମକାଣ୍ଡେର ବିକଳ ନେଇ । ଯୌଥ କର୍ମକାଣ୍ଡେର ଦ୍ୱାରା ମାନୁଷ ଶିଳ୍ପ-କାରଖାନା ଗଡ଼େ ତୁଲେ ଉତ୍ସବକେ ଶିଖିଦେଇ ଉଠିଥିଲେ । ଗୋତମ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପରିହାନୀୟ ଧର୍ମେ ତା ଦେଶନା କରେଛେ । ତାତେ ଯୌଥଭାବେ କାଜ କରଲେ ସୁଫଳ ପାଓଯା ଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ମାତ୍ରାଇ ଯୌଥଭାବେ କାଜ କରାର ଅଭ୍ୟାସ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସାଂଘବନ୍ଧ ହେଁ କାଜ କରଲେ ଉତ୍ସବକେ ଅବଶ୍ୟକ୍ତାବି । ମାନୁଷ ଯୌଥଭାବେ କାଜ କରଲେ ଏକଜନ ଅନ୍ୟ ଜୀବରେ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ । ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ । କଠିନ କାଜଓ ଯୌଥଭାବେ ସହଜେ ସମାଧାନ କରତେ ପାରା ଯାଏ । ଏ କାରଣେ ସବ କାଜ ସହଜେ ସୁମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏତେ ସୁଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ।

অনুষ্ঠানী

ক. সঠিক উভয়ের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে কী বলা হয় ?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. বুদ্ধরত্ন | খ. ধর্মরত্ন |
| গ. সংঘরত্ন | ঘ. ত্রিরত্ন |

২. কে দান গ্রহণের উভয় পাত্র ?

- | | |
|--------------------|----------------|
| ক. ডিক্ষারী | খ. দিশারী |
| গ. দুঃশীল ব্রাহ্মণ | ঘ. বিশুদ্ধ সংঘ |

৩. শিক্ষাগুরুকে কী বলা হয় ?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. সমাজপতি | খ. ধর্মপতি |
| গ. সেনাপতি | ঘ. জ্ঞানদাতা |

৪. পৃতিবীকে মাতা পিতা হলো—

- | | |
|-------------------|---------------|
| ক. ধর্মীয় শিক্ষক | খ. জীবন ভাতা |
| গ. পরম গুরু | ঘ. উভয় দেবতা |

৫. বুদ্ধ সমাজ উন্নয়নের জন্য কোন ধর্ম দেশনা করেছেন –

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ক. রাতন সূত্র | খ. ধর্মচক্র প্রবন্ধন সূত্র |
| গ. মৈত্রী সূত্র | ঘ. সপ্ত অপরিহানীয় সূত্র |

৬. কার মিলন সূর্খকর ?

- | | |
|-------------------|--------------|
| ক. সংঘের | খ. মানুষের |
| গ. স্বামী-স্ত্রীর | ঘ. ভাই-বোনের |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মাতাপিতা হলেন পুত্র-কন্যার |
২. লোক সমাজে মাত্রই গুরুজন |
৩. গুরুদের প্রতি পোষণ করা উচিত |

কৰ্মনা ও নিত্যকৰ্ম

৪. ছোটদের প্রতি স্নেহমতা প্রোবণ করা কর্তব্য।
৫. সংঘের সুখকর।
৬. শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি দেখাবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">১. বৌদ্ধরা প্রতিদিন২. শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে৩. এজন্য মাতা-পিতার মত৪. অভিবাদন করলে আয়ু, বৰ্ণ,৫. সংঘবন্ধ হয়ে কাজ করলে৬. সাধ্যমত এরূপ কাজ সম্পাদনের | <ol style="list-style-type: none">১. শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি উপরে।২. সুখ, বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।৩. উন্নতি অবশ্যস্তাৰী।৪. সকাল-সন্ধিয়া কৰ্মনা কৰে।৫. জন্য অংশগ্রহণ কৰবে।৬. শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।৭. সুফল লাভ হয়। |
|---|---|

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ত্রিরত্ন কৰ্মনা কাকে বলে ?
২. নিত্যকৰ্ম কাকে বলে ?
৩. গুরুজনদের প্রতি কীৱুপ ব্যবহার কৰবে ?
৪. পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী ?
৫. একতাৰৰ্থ হয়ে কাজ করলে কি উৎকার হয় লেখ।
৬. যৌথভাবে কাজ দ্বাৰা সমাজের কি কি উপকার হয় ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নিত্যকৰ্মের বৰ্ণনা দাও।
২. মাতাপিতার গুণ বৰ্ণনা কৰ।
৩. শিক্ষাগুরুর গুণ সম্পর্কে লেখ।
৪. পরিবার ও সমাজে বাস কৰতে হলে আমাদের কী কৰা কর্তব্য? বৰ্ণনা দাও।
৫. ধৰ্মীয় উৎসবে আমাদের কি কৰা কর্তব্য? এ সম্পর্কে লেখ।
৬. একতাৰৰ্থ হয়ে কাজ কৰলে যে সুযোগ লাভ হয় তাৰ বৰ্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

পূজা ও দান

বৌদ্ধধর্মে পূজা ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বগরণ পূজা ও দান দু'টিই পুণ্যকর্ম, যা দিয়ে মনকে পবিত্র ও সংযত করা যায়। দানচিন্তা উৎপন্ন করতে পূজা ও দানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বৌদ্ধরা নিয়মিত পূজা ও দান করে থাকে। প্রথমে আমরা পূজার গুরুত্ব ও গুণসমূহ জানব।

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল-বিকাল বুদ্ধের উদ্দেশ্য পূজা দিয়ে থাকে। এই পূজার মাধ্যমে দান চেতনা উৎপন্ন হয় এবং সৎকর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। চিন্তে মৈত্রী, করুণা ও উদারতা জগ্রত হয়। পূজা নানা ধরণের, যেমন: আহার পূজা, পুষ্প পূজা, পানীয় পূজা, প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা প্রভৃতি।

এতে তোমরা প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা সম্পর্কে জানবে।

প্রদীপ পূজা

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সন্ধিয়ায় প্রদীপ পূজা করে থাকে। প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে। অনুরূপভাবে বুদ্ধ জ্ঞানের আলো দ্বারা অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, তৃক্ষণা, মনের কালিমা লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি দূর করেছিলেন। তাছাড়া প্রদীপের আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ পূজার মাধ্যমে আমরা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বা অনিত্যতা উপলক্ষ্য করতে পারি। অনিত্য ভাবনা দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ, তৃক্ষণা প্রভৃতি ক্ষয় হয়। অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়ার জন্য বৌদ্ধরা প্রদীপ দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে থাকেন।

প্রদীপ পূজা বিহার বা প্যাগোড়ায় গিয়ে অথবা নিজ গৃহে করা যায়। আমরা জানি যে, কোন পূজা দেয়ার পূর্বে মন ও দেহকে পবিত্র কর্যতে হয়। পরিচ্ছন্নতা দেহ ও মনের আনন্দ আনয়ন করে। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

প্রদীপ পূজার পূর্বে পবিত্র মনে বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর প্রদীপ হাতে করজোরে ইঁটু ভেঙ্গে ঝিসে ত্রিভুজ বন্দনা করতে হয়। এরপর পূজার গাথাটি বিশুদ্ধ মনে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করত্যে হয়।



পিতামাতার সঙ্গে প্রদীপ পূজারত বালক-বালিকা
প্রদীপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ:

গানি

ঘনসারশ্প দিত্তেন দীপেন তমধর্মসিনা,
তিলোক দীপৎ সম্বুদ্ধৎ পূজযামি চতমোনুদৎ।

বজ্ঞানুবাদ

ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ অর্থকার দূর বর্গে। সে প্রদীপ দিয়ে ত্রিলোকের অজ্ঞানতা
বিনাশকারী সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে প্রদীপ পূজা

অন্ধকার ধৃঢ়সকারী এ দীপ দানে
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।

দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে ,
জ্ঞানের আলোক জ্ঞালিয়ে মোহ দূর করে ।

এ সলিতা এ তৈল যবে ফুরাইবে,
তখনি এ আলোকিত দীপ যাবে নিতে ।

এরূপ তৃষ্ণা তৈল গেলে ফুরাইয়া ,
জীবনের দুঃখ শিখা যায় নিতিয়া ।

এ বৃদ্ধনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায় ,
সর্ব তৃষ্ণা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

গাথা আবৃত্তির পর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করবে। এরপর সুন্দর করে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের সম্মুখের আসনে প্রদীপ জ্বালাবে। প্রদীপ জ্বালানোর পর আবার দু'হাঁটু ভেঙ্গে বুদ্ধকে প্রণাম জানাবে। বুদ্ধের গুণ অনুসরণ করবে। প্রদীপের আলোর ন্যায় জীবন গড়ার শপথ নেবে। অনিত্য ভাবনা করবে। ক্ষণস্থায়ি জীবনের কথা চিন্তা করবে।

ধূপ পূজা

সুগন্ধি ধূপ দিয়েই এই ধূপ পূজা করা হয়। ধূপের সুগন্ধি ও সুবাস যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের কুশল কর্মের সুবাস সর্বত্র বিরাজ করে। ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে। এতে মন আনন্দে ভরে যায়।

সকাল বিকাল দু'বেলা প্রার্থনার সময় ধূপ পূজা করা যায়। তবে ধূপ পূজার উত্তম সময় হল সন্ধ্যাবেলা। ধূপ পূজার জন্য প্রয়োজন ধূপদানী অথবা ধূপ কাঠি। ধূপদানীতে ধূপ রেখে অথবা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করতে হয়। বুদ্ধের সামনের বেদীতে এ পূজা দিয়ে প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। তারপর উত্তি চিন্তে ধূপ পূজার গাথাটি আবৃত্তি করতে হয়। একাগ্র চিন্তে গাথা আবৃত্তি না করলে চিন্তে প্রীতিভাব আসে না।

পূজা ও দান

ধূপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ:

গালি

গম্ভসম্ভার যুক্তেন ধূপেনহং সুগন্ধিনা,
পূজযে পূজনেয্যস্তৎ পূজা—ভাজন মুক্তমং।

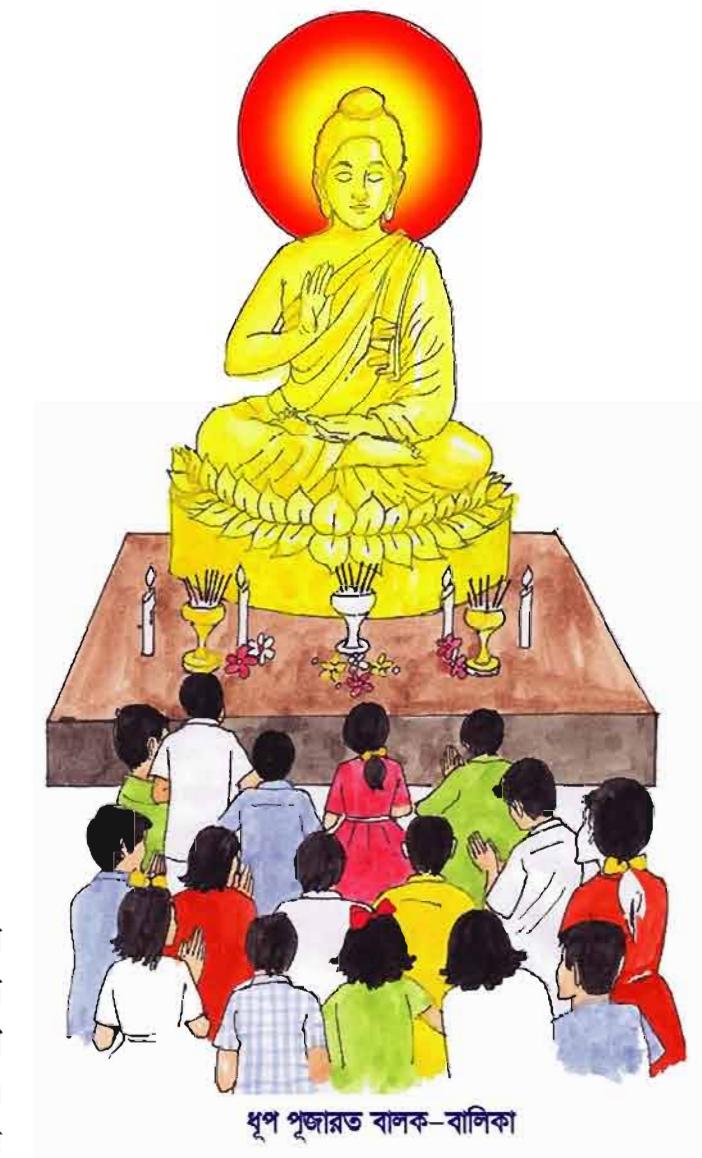
বজ্ঞানুবাদ

গম্ভসম্ভারযুক্ত এ সুগন্ধি ধূপের দ্বারা
আমি সেই পূজাযোগ্য বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে ধূপ পূজা

গম্ভসম্ভারযুক্ত এ ধূপ দানে,
পূজিতেছি ভক্তিচিত্তে বুদ্ধ তগবানে।
ধূপের সুগন্ধে চারিদিক হয় সুবাসিত,
পুণ্যের সঞ্চয় তেমনি হয় সুরভিত।
সুগন্ধি এ ধূপদানে তোমায় মোরা শরি,
জন্ম—জন্মান্তরে যেন পৃশ্য লাভ করি।

গাথা আবৃত্তি শেষে ভক্তিচিত্তে করজোরে
বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করবে। বিহারে
গিয়ে অথবা নিজ বাড়িতে ধূপ পূজা করা
যায়। তোমরা নিজে পূজা দেবে এবং এ
গাথাগুলো শ্রদ্ধার সাথে সুর করে আবৃত্তি
করবে। এতে তোমাদের চিত্ত নির্মল হবে এবং বুদ্ধের প্রতি গভীর ভক্তি উৎপন্ন হবে।



ধূপ পূজারত বালক-বালিকা

দান

মানব জীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। ‘দান’ শব্দের অর্থ হল ত্যাগ। এই ত্যাগ হল নিঃস্বার্থতাবে কাউকে কিছু দেওয়া বা দান করা। নিঃস্বার্থ ত্যাগই প্রকৃত দান। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত উদার হয়, ত্যাগ শক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে দুঃখ, অসহায়দের

প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। দানের দ্বারা মানুষের চিন্তা পরিশুম্ব হয় এবং লোভ, দেষ, মোহ বিদূরিত হয়। শুধু তাই নায়, দান স্বর্গের সোপান স্ফৱ্রূপ। দান মানুষের দুঃখ আশকারীও বটে। তাই ইহকাল ও পরকালে শান্তি সুখ লাভের আশায় মানুষ দান দিয়ে থাকে। দানীয় বস্তু বা দানীয় সামগ্রী নিয়ে পালিতে একটি গাথা আছে। যেমন—

পাণি

অন্ন, পানৎ, বস্ত্রৎ, যানৎ,
মালাগম্বৎ, বিলেপনৎ,
সেয্যা, বস্ত, প্রদীপেয়ৎ
দানবস্তু ইমে দসা।

বঙ্গানুবাদ

অন্ন, জল, বস্ত্র, যান, মাল্য, গম্ব আর বিলেপন, শয্যা, গৃহ, প্রদীপ — এই দশ প্রকার দানবস্তু শান্তের বচন।

এছাড়াও নানা ফল—মূল, অর্ধ—বিস্ত, জায়গা—জমি প্রভৃতি দান করা যায়। তবে বৌদ্ধ মতে সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো ধর্ম দান ও বিদ্যা দান।

দানের পূর্বে দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন রাখতে হয়। যেমন :

১. দানীয় বস্তু সৎ উপায়ে অর্জিত হতে হবে।
২. লোভ, দেষ ও মোহশূন্য হয়ে উদার চিন্তার দান দিতে হবে।
৩. সৎ পাত্রে দান দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে শীলবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাই শীলবান ব্যক্তিকে বা ভিক্ষু শ্রামণকে দান দিলেই বেশি পুণ্য লাভ হয়।

দান বিভিন্ন রকম। যেমন : সংস্কার দান, অস্টপারিষকার দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি।

পূজা ও দান

অষ্টপরিষকার দান

বৌদ্ধধর্মে দান একটি অন্যতম পুণ্যকর্ম। এ দান অনেকখানি সংঘদানের মত। বৌদ্ধরা নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় ও সুখ শান্তি লাভের আশায় এ দান করে থাকে। এ দানে জ্ঞাতিগণেরও মঙ্গল হয়। দাতারও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

অষ্টপরিষকার দান বলতে ভিক্ষুর ব্যবহার্য আটটি দ্রব্য সামগ্ৰিকে বোঝায়। এগুলো হলো—
সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অস্তৰ্বাস, পিণ্ডপাত্ৰ, ক্ষূর, সূচ, সূতা, কটিবন্ধনী ও জলছাকুনি।

যে কোন দায়ক ইচ্ছা করলে বছরের যে কোন সময় এ দান একাধিক বার করতে পারে।
ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যেই এ দান দেওয়া হয়। নিজ গৃহে অথবা বিহারে এই দান সম্পন্ন করা
যায়। এ দান করতে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকারা
ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ বা ফাঁৎ করেন।

অষ্টপরিষকার দানের নিয়ম হল ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে নানা দানীয় বস্তু সাজিয়ে
ভিক্ষুসংঘের সামনে রাখতে হয়। তারপর পরিবারের সদস্য, স্বজন পরিজন ও আমন্ত্রিত
অতিথিরা সকলে ভিক্ষুসংঘের সামনে করজোরে বসেন। প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করে
পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। এরপর ভিক্ষুদের মুখে মুখে অষ্টপরিষকার দানের গাথাটি
তিনবার আবৃত্তি করতে হয়। গাথা আবৃত্তির সময় চিন্তকে প্রফুল্ল রাখতে হয়। দানের প্রতি
মনোযোগ রাখতে হয়।

গাথাটি নিম্নরূপ :

ইমৎ ভিক্খৎ অট্ঠপরিকখারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।

দুতিয়ম্পি ইমৎ ভিক্খৎ অট্ঠপরিকখারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।

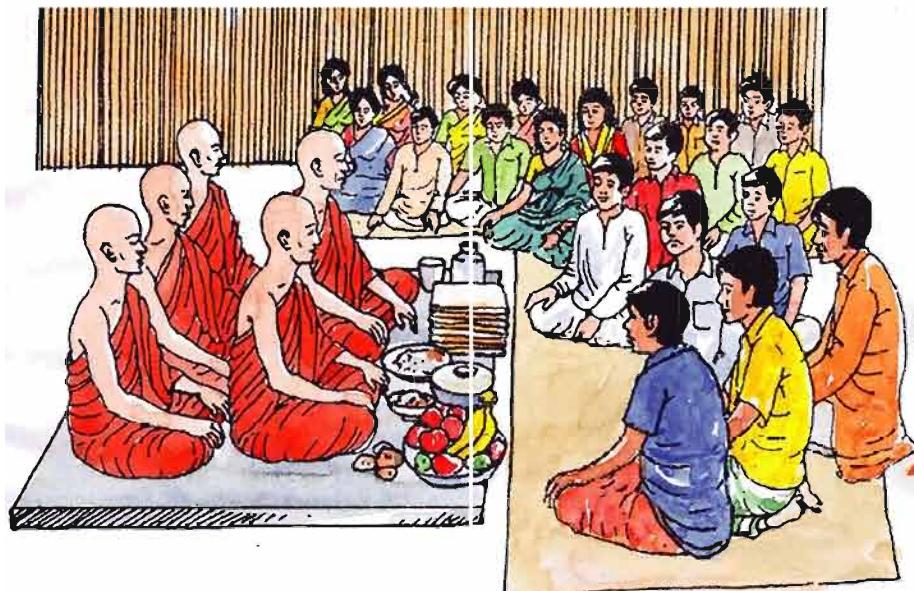
ততিয়ম্পি ইমৎ ভিক্খৎ অট্ঠপরিকখারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।

বঙ্গানুবাদ

উপকরণসহ এ অষ্টপরিষকার দানীয় বস্তু; ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

দ্বিতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষকার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

তৃতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষকার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।



অষ্টপরিষ্কার দানে উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্গ ১৩ দায়ক-দায়িকাসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অষ্টপরিষ্কার দানের পূর্বে ভিক্ষুগণ জীবিত ও মৃত জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের জন্য সূত্রপাঠ করেন। অষ্টপরিষ্কার দানের গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্মদেশনা করেন। দেশনা শেষে উপস্থিত দায়ক-দায়িকরা সাধু সাধু সাধু বলে তিনবার সাধুবাদ প্রদান করেন। এভাবে অষ্টপরিষ্কার দানকার্য সম্পন্ন করা হয়। এ দানের দ্বারা দাতার অশুভ ও অমঙ্গল দূর হয়। এতে দাতার জ্ঞাতিগণও সুখী হন।

তোমরা সব সময় দান করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। মানুষের আপদে বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। গরীব, দুঃখীকে সব সময় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে। প্রতিবেশীদেরকেও সাহায্য করবে। তোমাদের শ্রেণিতে কোন দরিদ্র ক্ষম্তি থাকলে তাকে সাধ্যমত সাহায্য করবে। তাকে খাতা কলম কিনে দেবে। প্রয়োজন হলে অর্থও দেবে।

তোমরা খাদ্যদ্রব্যও দান করবে। প্রতিবেশি বা দেশের যে কোন দুর্যোগ, দৈব-দুর্বিপাকে দান দিতে এগিয়ে আসবে। সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এতে জনসেবা তথা মানব সেবা হবে।

যে কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দান দেওয়া ভাস্তো। ছোটবেলা থেকেই তোমরা দানের অভ্যাস গড়ে তুলবে। দানে ত্যাগশক্তি বাড়ে। দানের পুণ্য ফলে জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. বুধ হলেন-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ক. আলোর প্রদীপ | খ.. ধ্যানের প্রদীপ |
| গ. বিজ্ঞের প্রদীপ | ঘ.. চিজ্ঞের প্রদীপ |

২. আমাদের মনে কিসের প্রদীপ ছালাতে পারি?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. রাতের প্রদীপ | খ. দিনের প্রদীপ |
| গ. জ্ঞানের প্রদীপ | ঘ.. কামনার প্রদীপ |

৩. প্রদীপের আলো-

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. চিরস্থায়ী | খ.. অর্ধস্থায়ী |
| গ. উর্ধস্থায়ী | ঘ.. ক্ষণস্থায়ী |

৪. ধূপ পূজার জন্য কোন সময় উত্তম?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. সম্ম্যা বেলা | খ.. সকাল বেলা |
| গ. দুপুর বেলা | ঘ.. বিকাল বেলা |

৫. সংবাদান কাদের দান করা হয়?

- | | |
|--------------------|----------------|
| ক. দায়ক-দায়িকাকে | খ.. শ্রমণদেরকে |
| গ. ভিক্ষুসংঘকে | ঘ.. জ্ঞাতিগণকে |

৬. দানের পূর্বে দাতাকে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?

- | | |
|---------|----------|
| ক. ২ টি | খ.. ৩ টি |
| গ. ৪ টি | ঘ.. ৫ টি |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পৃথিবীর সবকিছুই।
২. সর্বত্বষ্ঠা, ক্ষয় যেন হয়।
৩. ধূপের মত আমাদের কুশলকর্মের সুবাস যেন বিরাজ করে।
৪. পুণ্যের তেমনি হয় সুরভিত।
৫. দানের গুরুত্ব মানব জীবনে।
৬. মানুষের মধ্যে ব্যাক্তিই শ্রেষ্ঠ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. বৌদ্ধধর্মে পূজা ২. সমাজ ও বিশ্বে জ্ঞানের ৩. ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ ৪. ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা ৫. অষ্টপরিষ্কার দান বলতে ৬. সৎ পাত্রে দান। 	<ol style="list-style-type: none"> ১. প্রদীপ ছড়াতে পারি। ২. দেওয়াই উভয়। ৩. ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪. ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে ৫. অন্ধকার দূর করে। ৬. ভিক্ষু সংঘকে প্রদণ নানা দ্রব্য সামগ্রিকে বোৰায়। ৭. সুগতি লাভও করা যায়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. দান শব্দের অর্থ কী? দান করলে কী হয়?
২. প্রদীপ পূজা করলে কী হয়?
৩. জীবন অনিত্য কেন?
৪. অষ্টপরিষ্কার দান করতে কয়েন ত্তিক্ষুর প্রয়োজন? ভিক্ষুরা সেখানে কী করেন?
৫. দানের পূর্বে দাতাকে কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?
৬. কাকে দান দিলে বেশি পুণ্য লাভ হয়।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রদীপ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
২. পদ্যাকারে ধূপ পূজাটি লেখ।
৩. অসহায়-দুঃস্থদেরকে সাহায্য করা উচিত কেন বর্ণনা কর?
৪. ধূপ পূজার পালি গাথাটি লেখ।
৫. অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।
৬. দানের সুফল তুলে ধর।



চতুর্থ অধ্যায়

শ্রামণ্য শীল

শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র, নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা। সুশীল বালক বলতে চরিত্রবান বালককেই বোঝায়। সুতরাং একজন সৎ মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে শীল বলে।

শ্রামণ্য শীল বলতে দশশীলকে বোঝায়। অর্থাৎ শ্রামণগণ যে শীল পালন করেন তাকে শ্রামণ শীল বলা হয়। প্রত্যেক গৃহীকে একবার হণ্ডেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। শ্রামণ বলতে শিক্ষাধীকে বোঝায়। শ্রামণ হচ্ছে ভিক্ষু হবার প্রাথমিক স্তর। শ্রামণ হয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকতে হয়। শ্রামণদের নিত্য পাঞ্জীয় শীলই দশশীল। শ্রামণেরা সৎকর্মে রত থাকেন।

প্রবৃজিতেরা সুখের পথ খুঁজে পান। তাঁদের পুণ্যকর্ম করার যথেষ্ট সময় থাকে। তাঁদের পুণ্যকর্ম পরিশূল্য থাকে। তাঁতে মুক্তির পথ সুগম হয়। বুদ্ধশাসনে পুত্র দান করলে মাতাপিতার প্রভুত পুণ্য সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠু ধর্মীয় জীবন গঠনের জন্যই প্রবৃজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য।

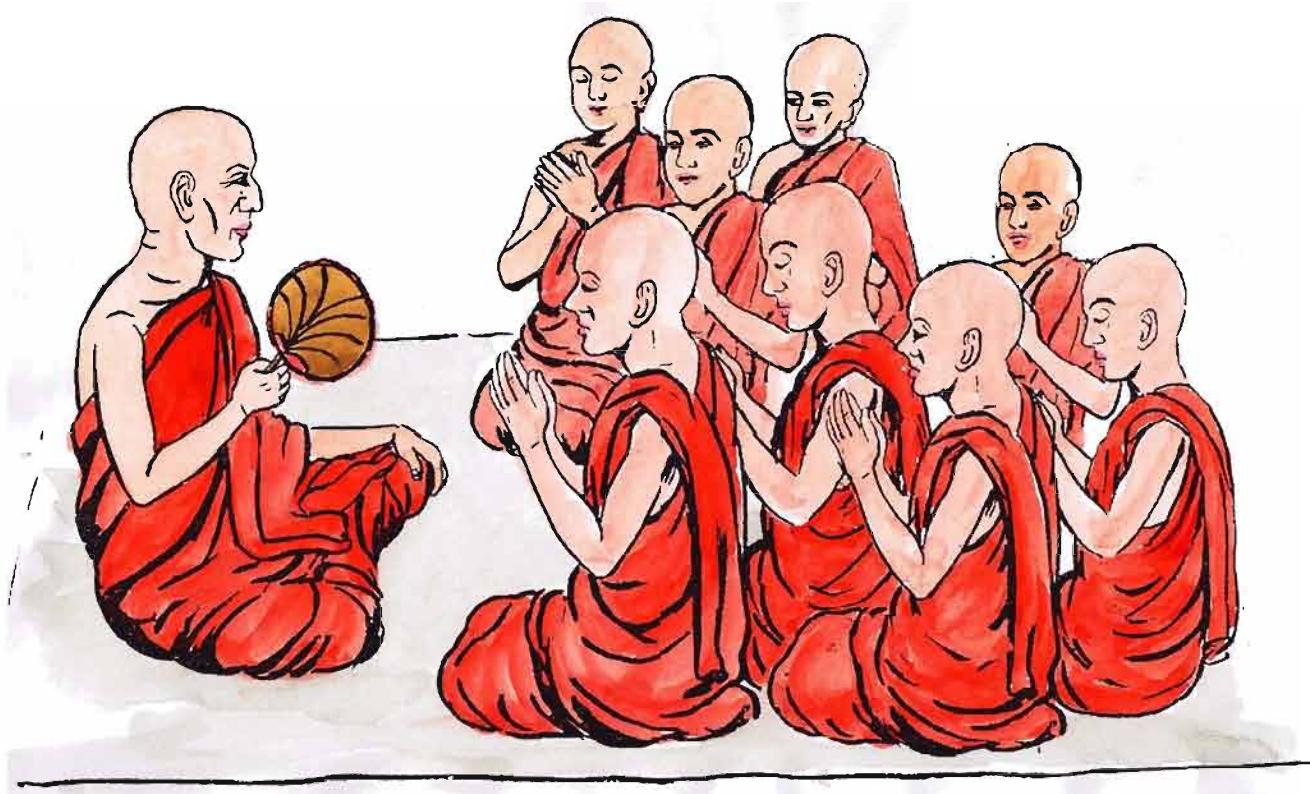
এখন আমরা গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য কী তা জানব। গৃহী বা উপাসক-উপসিকারা নিত্য পঞ্চশীল পালন করে থাকে। তারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীলও পালন করে। সুতরাং পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গৃহীদের প্রতিপাল্য বিষয়।

গৃহীদের মধ্যে যাঁরা প্রবৃজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন তাঁদের শ্রামণ বলা হয়। শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যবর্তী স্তর। ভিক্ষু হতে হলে প্রথমে শ্রামণ হতে হয়। শ্রামণদের দশশীল পালন করতে হয়। তাঁদেরকে বিহারের প্রাত্যহিক কর্মও সম্পন্ন করতে হয়। তোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রামণদের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়। তাঁরপর ভালোভাবে হাত, মুখ ধূয়ে নিতে হয়। সকাল বিকাল ভিক্ষুর নিকট দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

এবার দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা জানব।

দশশীল গ্রহণ করার সময় নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বসতে হয়। প্রথমে ত্রিরত্ন বসনা

করতে হয়। তারপর গুরু ভিক্ষুর নিকট দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। আবৃষ্টি করার সময় পালি ও বাংলা উচ্চারণ শুন্দরভাবে করতে হয়।



শ্রামণগণ গুরু ভন্তের নিকট দশশীল গ্রহণরত

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পরবজ্জা সামণের দসসীলং ধন্মং যাচামি অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিয়ম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পরবজ্জা সামণের দসসীলং ধন্মং যাচামি অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিয়ম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পরবজ্জা সামণের দসসীলং ধন্মং যাচামি অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

শ্রামণ্য শীল

ত্বরীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ত্বরীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দশশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
২. অদিনাদানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৩. অব্রহাচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৫. সুরামেরেয-মজ্জ-পমাদট্টনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৭. নচ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্মনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন- ধারণ মণ্ডন বিভূসনট্টনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
৯. উচ্চাস্যন-মহাস্যনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।
১০. জাতরূপ রজত পটিগৃহনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিয়ামি।

বাঞ্ছা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদস্ত্ববস্তু গ্রহণ (চুরি) থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহাচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা-মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. মাল্যধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য, অলংকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চাসন ও মহাশয়্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা-রূপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

শীল পালনের মাধ্যমে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি?

সর্বজীবে দয়া, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলো শিক্ষা লাভ করি। এ নৈতিক গুণগুলো তোমরাও অর্জন করবে। অন্যদেরকেও অর্জন করতে সহায়তা করবে।

দুষ্ট বালকদের তোমরা কীভাবে সৎপথে আনবে? মনে কর, তোমাদের কোন বন্ধু ডোবার ব্যাঙকে ঢিল ছুরছে। কেউ বা একটি ছাগল ছানা ধরে অনর্থক মারধর করছে। মনে রাখবে, এগুলো অত্যন্ত খারাপ আচরণ। তোমরা এসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এদের এভাবে কষ্ট দিওনা। প্রাণীর প্রতি তোমাদের এই যে মমতা— এটাকেই বলে জীবে দয়া। এটা পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীলের প্রথম শীল।

এবার শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি ঘটনা বলব। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্রাহ্মণের ছেলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত। সে মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। পরে সেই ব্রাহ্মণপুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্জিত বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। বারাণসীর রাজা তার পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে রাজদরবারে পুরোহিতের পদে নিয়োগ করেন।

তিনি প্রতিদিন শীল পালন করতেন। কোনদিন একটি শীলও ভঙ্গ করতেন না। রাজা-প্রজা সবাই শুন্দৰ করতেন। পঞ্জিত ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন— আমাকে সবাই কেন শুন্দৰ করে তা পরীক্ষা করব।

তিনি একদিন রাজভাস্তার থেকে একখানি সোনার কাঠি তুলে নিলেন। ধনরক্ষক তাঁকে বেশি শুন্দৰ করতেন বলে প্রথম দিন কিছু বলল না। তিনি তিন দিনে তিনটি সোনার কাঠি রাজভাস্তার থেকে অন্য জ্যায়গায় রেখে দিলেন। তখন ধনরক্ষক তাকে রাজার নিকট বেঁধে নিয়ে বলল, ইনি রাজকীয় ধন আআসাও করেছেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন— ঠাকুর, একথা কি সত্য? ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, আমি আপনার ধন আআসাও করিনি। আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, শীলবান ও বিদ্যান এ দুজনের মধ্যে কার গুণ বেশি। এখন বুবালাম, বিদ্যানের চেয়ে শীলবান বা চরিত্রবানই শ্রেষ্ঠ।

রাজা ব্রাহ্মণের প্রশংসা করলেন। তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য সততার

শ্রামণ্য শীল

সাথে সম্পন্ন করতে লাগলেন। বলত এই ত্রাঙ্কণ কে? ইনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব (গৌতম বুদ্ধ)। তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের একটি উদাহরণ দিয়ে কাউকে চুরি না করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

বিদ্যা এবং চরিত্র দুটোই মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার কোন মূল্য নেই। তোমরাও বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে নিজেদের চরিত্র গঠন করবে। শীল হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার।

এবার শীল পালনের সুফল সম্পর্কে জানব।

এক সময় বুদ্ধ ধর্ম প্রচার মানসে পাটলি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দান করেন। বুদ্ধ ভোজন শেষে তাদের উদ্দেশ্যে শীল পালনের সুফল বর্ণনা করেন। শীল পালনের সুফলগুলো নিম্নরূপ:

১. শীলবানদের শীল পালনের সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. শীল পালনের দ্বারা সৎপুরুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়।
৩. শীলবান ব্যক্তিরা সর্বদা নির্ভয় থাকে। নিঃসংজ্ঞাচে ও প্রফুল্ল চিন্তে যথা তথায় উপস্থিত হন।
৪. শীলবানেরা সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন।
৫. তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।
৬. তাঁরা অপরের উপকার সাধন করে পুণ্য অর্জন করেন।
৭. তাঁদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

তোমরা দুঃশীল বা চরিত্রহীন লোকের কী কী ক্ষতি হয় জান?

১. সে পাপ কাজ করে সৎক্ষু হারায়।
২. সকলে তাকে নিন্দা করে।
৩. সে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।
৪. সে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিন কাটায়।
৫. তাঁর দুর্নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়।

জগতে সবাই সুখ চায়। দুঃখ কেউ চায় না। সুখ পেতে হলে সচরিত্রিবান হবে। পুণ্য পথে চলবে। এতে তোমরা ইহকাল ও পরকারে শান্তি লাভ করবে।

শ্রামণ্য শীল

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রামণ্য শীল ভিক্ষু জীবনের স্তর ।
২. শ্রামণদের নিত্য শীলই দশশীল ।
৩. শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর..... স্তর ।
৪. এখন বুঝলাম, বিদ্বানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।
৫. শীলবানেরা সজ্ঞানে..... করেন ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. প্রবৃজিতেরা সুখের পথ ২. পথশীল ও অফশীল গৃহীদের ৩. গৃহীরা পরিবার পরিজন ৪. অনুগ্রহ করে আমাদের ৫. দুঃশীল ব্যক্তি মৃত্যুর পর ৬. শীলবানেরা সজ্ঞানে 	<ol style="list-style-type: none"> ১. নিয়ে বাস করে । ২. মৃত্যুবরণ করেন । ৩. শীল প্রদান করুন । ৪. প্রতিপাল্য বিষয় । ৫. খুঁজে পায় । ৬. জীবন গঠন করতে হয় । ৭. দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. সুশীল বালক বলতে কাকে বোঝায় ?
২. শ্রামণ্য শীল কাকে বলে ?
৩. দশশীল কাদের পালন করতে হয় ?
৪. নেতৃত্ব গুণের তিনটি উদাহরণ দাও ।
৫. পালি ‘মুসাবাদা’ শব্দের বাংলা অর্থ কী ?
৬. ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাজপরিবারে কী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শীলবান ব্যক্তির বিশেষ গুণগুলো তুলে ধর ।
২. গৃহী শীল ও শ্রামণ্য শীলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর ।
৩. দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় বর্ণনা কর ।
৪. দশশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ ।
৫. শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্রক্ষের কাহিনীটি বর্ণনা দাও ।
৬. শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ কর ।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি অভিধর্ম পিটক

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধরা এ ধর্মের অনুসারী। বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মবাণী প্রচার করেন। এ সময় তিনি শিষ্য ও অনুসারীদের নিকট ধর্মীয় রীতি নীতি, উপদেশ ও বাণী দেশনা করেছেন। এসব ধর্মবাণী যে সমস্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ।

তোমরা আগের শ্রেণিতে ত্রিপিটকের তিনটি অংশের কথা জেনেছ। সেই তিনটি হলো— ১. বিনয় পিটক, ২. সূত্র পিটক ও ৩. অভিধর্ম পিটক।



ত্রিপিটকের শেষ খন্দ

ত্রিপিটক পাণি ভাষায় রচিত। বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ মুদ্যস্থ করে রাখতেন। তখন লিখন পদ্ধতির খুব বেশি প্রচলন ছিল না। সে কারণে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক শিষ্য পরম্পরা মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল।

ইতোপূর্বে তোমরা বিনয় পিটক ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে জেনেছ। অভিধর্ম হল ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এখন আমরা অভিধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানব।

ত্রিপিটক সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্বের পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে এতে দেখা যায়, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রধানত ধর্ম

ও বিনয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ম (সূত্র) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়েছিল। এর একশত বছর পর যশ স্থবির কর্তৃক দ্বিতীয় সংগীতি আহ্বান করা হয়। এতেও আগের মত ধর্ম (সূত্র) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়।

শ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিনি ভাগে বিভক্ত করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক রচিত হয়। এ সময় অভিধর্ম পিটকের পূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে।

ত্রিপিটক পরিচিতি

সম্রাট অশোকের পুত্র থের মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম প্রচারে গমন কালে এ ত্রিপিটক সঙ্গে নিয়ে যান। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বটগামিনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়।

নবাঙ্গা সংখ্যাসন

ত্রিপিটকের মধ্যে অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নয়টি অঙ্গ বা ত্রিপিটকের নয়টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নয়টি বিভাগকে ‘নবাঙ্গা সংখ্যাসন’ বলা হয়। এই বিভাগ ত্রিপিটকের সম্পূর্ণ গ্রন্থকে বা কোনো বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকে বুবায় না। এই বিভাগ হল বিষয়বস্তু অনুযায়ী ত্রিপিটকের বিভাজন। নবাঙ্গা সংখ্যাসনের নয়টি ভাগের নাম হল: সুন্ত, গেয়, বৈয়াকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুন্তক, জাতক, অব্ভূতধন্ম এবং বেদল্ল।

অভিধর্মের উৎপত্তি

অভিধর্ম ত্রিপিটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। অভিধর্মকে ত্রিপিটকের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ প্রথমে অন্যান্য ধর্মবাণী ঘোষণা করলেও অভিধর্ম বিষয়ে দেশনা করতে চাননি। কারণ সাধারণ মানুষ ও দেবগণ জটিল দর্শন ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। সে কারণে প্রথম সূত্র ও বিনয় বিষয়ে দেশনা করেন।

বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সপ্ত স্থানে বুদ্ধ অধিগত জ্ঞান ও ধর্মের তাৎপর্য চিন্তা করেন। ষষ্ঠতম সপ্তাহ দিবসে অভিধর্ম পিটকের ছয়টি গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা করেন। সপ্তম সপ্তাহে সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম সম্পন্ন করেন।

এরপর বুদ্ধ তাবতিঃস দ্বার্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিনমাস ব্যাপী মাতৃদেবী ও দেবতাদের প্রথম অভিধর্ম দেশনা করেন।

তাবতিঃস দেবলোক থেকে মর্ত্যে এসে মানব কল্যাণে অভিধর্ম দেশনা করেন। এভাবেই অভিধর্মের উৎপত্তি হয়।

অভিধর্ম পিটক কী?

তোমরা পূর্বেই জেনেছ, অভিধর্ম ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এটি ত্রিপিটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালি সাহিত্য মতে, ধর্ম ও অভিধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

শুধু ধর্মের মনস্ততাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দানের জন্য ‘অভি’ উপসর্গটি যুক্ত করা হয়েছে। অভিধর্ম শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অতিরিক্ত ধর্ম, অধিকতর ধর্ম। তাই বলা হয় সূত্রাত্তিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ এ চারটি বিষয়ে সূক্ষ্মতাবে আলোচনা করা হয়েছে অভিধর্ম পিটকে।

অভিধর্ম পিটকে যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার। অভিধর্ম পিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ আছে। এ সাতটি গ্রন্থের সমষ্টিকে সপ্তপ্রকরণ বলা হয়। যথা : ১. ধর্মসংজ্ঞানি, ২. বিভঙ্গা ৩. ধাতুকথা ৪. পুঁঁপু পঞ্চাঙ্গভি ৫. কথাবখু ৬. যমক ৭. পট্ঠান।

প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

১. ধর্মসংজ্ঞানি: এর অর্থ ধর্মের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা। এটি অভিধর্ম পিটকের সারাংশ। এতে চিত্ত ও চৈতসিকের পরিচয়, জড় পদার্থের বর্ণনা আছে। বিশেষ করে কুশল ও অকুশল চিত্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মসংজ্ঞানির বিষয়বস্তু দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

২. বিভঙ্গা: এ গ্রন্থের বিষয়ও দর্শনতাত্ত্বিক। এতে স্ফৰ্ত্ত, ধাতু, ইন্দ্রিয়, তথা আমাদের শরীর ও মনের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চস্ফৰ্ত্ত হল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তু অতি চমৎকার।

৩. ধাতুকথা: ধাতুকথা শব্দের অর্থ ‘ধাতু’ সম্পর্কীয় কথা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। তাই এটি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। এতে ধ্যানপরপায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা আছে। এছাড়াও পঞ্চস্ফৰ্ত্ত, আয়তন, ধাতু, ধ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

৪. পুঁঁপু পঞ্চাঙ্গভি: ‘পুঁঁপু’ শব্দের অর্থ ব্যক্তি, যা দারা মানুষকে বোঝায়। ‘পঞ্চাঙ্গভি’ হল প্রজ্ঞপ্রতি, প্রকাশ বা পরিচয়। বিভিন্ন প্রকার পুঁঁপুরের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এ গ্রন্থে স্ফৰ্ত্ত, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় এবং পুদ্ধাল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্রতির উল্লেখ আছে।

৫. কথাবখু: এটি অভিধর্মের পঞ্চম গ্রন্থ। একে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। তৃতীয় সংগীতি শেষে মোঁলিপুত্র তিস্স স্থারিব কথাবখু রচনা করেন। মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি খণ্ডনই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কথাবখু তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পালি ত্রিপিটক সাহিত্যে কথাবখু গ্রন্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বির্তক

ত্রিপিটক পরিচিতি

সৃষ্টি হয়েছে। মোঘলিপুত্র তিষ্য স্থাবির এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন খেরবাদ বা স্থাবিরবাদই বুদ্ধের মূল নীতি। এটাকে বিভজ্যবাদও বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কথাবশু একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

৬. যমক: ‘যমক’ শব্দটি বা জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে স্বপক্ষীয় ও পতিপক্ষীয় প্রশ্নের সহজ সমাধান রয়েছে। এতে কুশল, অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা আছে। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত এবং দশ প্রকার যমকে বিভক্ত। যেমন— মূল যমক, খন্ধ যমক, চিত্ত যমক, সচ যমক ইত্যাদি।

৭. পট্ঠান: ‘পট্ঠান’ শব্দের অর্থ মূল কারণ বা প্রকৃত কারণ। এর বিষয়বস্তু প্রতীত্যসমৃৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত। বিশেষত নামরূপ বা শরীর ও মনের অনিত্যতা ও অনাত্মা সম্পর্কে আলোচনাই এ গ্রন্থে গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন— ১. আলম্বন ২. ধর্মনিশ্চয় ৩. কর্ম এবং ৪ অঙ্গি। নির্বাণ ব্যতীত সমস্ত জাগতিক বস্তুর কার্যকারণ নির্ণয় করাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলো ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক। বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অজন্মের জন্য এসব গ্রন্থ পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. গৌতম বুদ্ধ কোন ধর্ম প্রচার করেন?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. হিন্দুধর্ম | খ. বৌদ্ধধর্ম |
| গ. জৈনধর্ম | ঘ. খ্রিস্টধর্ম |

২. বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কী ?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. গীতা | খ. বেদ |
| গ. ত্রিপিটক | ঘ. ধর্মপদ |

৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় অভিধর্ম দেশন করেন ?

- | | |
|------------------|----------------|
| ক. তাবতিঃস ঘর্গে | খ. বার্মা |
| গ. সারনাথে | ঘ. শ্রীলঙ্কায় |

৪. কোন সংগীতিতে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয় ?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. প্রথম সংগীতি | খ. তৃতীয় সংগীতি |
| গ. দ্বিতীয় সংগীতি | ঘ. চতুর্থ সংগীতি |

৫. অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে ?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. সাতটি | খ. তিনটি |
| গ. পাঁচটি | ঘ. আটটি |

৬. অভিধর্মকে ত্রিপিটকের কী বলা হয় ?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. মষ্টিষ্ঠ | খ. হৃদপিণ্ড |
| গ. আদিতম | ঘ. বিশ্লেষক |

৭. কোন রাজার সময় ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. বটগামিনী | খ. ধর্মপাল |
| গ. কনিষ্ঠক | ঘ. অজাতশত্রু |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. অভিধর্ম পিটক ত্রিপিটকের বিভাগ।
২. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
৩. একে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত বলা হয়।
৪. মোঞ্চলিপুস্ত তিষ্য স্থাবির রচনা করেন।
৫. যমক শব্দটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. পট্ঠান শব্দের অর্থ বা।

ত্রিপিটক পরিচিতি

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাধারণ মানুষের মুখের	১. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
২. বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ	২. অন্যতম দর্শন শাস্ত্র।
৩. বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পর	৩. ভাষা ছিল পালি।
৪. বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও	৪. মুখস্থ করে রাখতেন।
৫. ধাতুকথা বৌদ্ধধর্মের	৫. ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
৬. ধর্মসংজ্ঞানির বিষয়বস্তু	৬. চিন্ত হল মানুষের মন।
	৭. দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
২. নবাঙ্গা স্থান বলতে কী বুঝ?
৩. অভিধর্ম পিটককে সপ্তপ্রকরণ বলা হয় কেন?
৪. পঞ্চক্ষণ্ধ কী কী?
৫. অভিধর্ম পিটকের চারটি প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী?
৬. কখন ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম লিখে যে কোন দুটি গ্রন্থের বর্ণনা দাও।
২. ধর্মসংজ্ঞা ও বিভক্তি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. পুঁগল শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৪. কথাবথু গ্রন্থ কে রচনা করেন? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৫. পট্ঠান শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. যমক কাকে বলে? যমক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম ও কর্মফল

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হল কর্মবাদ। ভাল কর্ম সুফল এবং মন্দ কর্ম কুফল প্রদান করে। এরূপ দৃষ্টি বা ধারণাকে কর্মবাদ বলে। কর্মের গতি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবন কর্মময়। প্রাণীরা কর্মফলের কারণে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

বুদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন:

প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীদের একান্ত আপন। সকলেই কর্মের উত্তরাধিকারী। কর্মই জীবের পুনর্জন্মের হেতু। কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়। ভাল-খারাপ যে যেরূপ কর্ম করে সে সেরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম জীবকে ইন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নিচ নানাভাবে বিভক্ত করে।

ভগবান বুদ্ধ কুশল কর্মের কথা বলেছেন। ভাল কাজ করলে সকলের প্রশংসা পায়। পুণ্য লাভ হয়। জীবন সুন্দর হয়। সুখী হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দায়ক। পুণ্যবান ব্যক্তিরা আত্মত্পত্তি লাভ করেন। তাঁদের নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। দীর্ঘায়ু হয়। ভাল কাজকে কুশল কর্ম বলে।

খারাপ কাজ করলে সবাই নিন্দা করে। পাপ টৎপন্ন হয়। পাপীরা দুঃখে পতিত হয়। কুকর্ম অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক। পাপীরা কুকর্মে লিঙ্গ থাকে। তারা সকলের নিন্দার পাত্র হয়। লোত, দেষ ও মোহ এগুলো দুষ্কর্মের অন্তর্গত। পাপীরা মানুষের হিত ও মঙ্গল কামনা করে না। দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে। মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। তাই খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে।

জীবনের অপূর্ণতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। যার দুঃখ সে নিজেই সৃষ্টি করে। নিজের সুকর্মের জন্য নিজেই সুখ ভোগ করে। কুকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে। মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ছেলেমেয়েরা সংজীবন গঠন করলে মা বাবা আনন্দিত ও প্রশংসিত হয়। তাই বুদ্ধ বলেছেন— নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেউ নয়। স্বর্গ-নরক নিজেদেরই পরিণতি। সেজন্য বলা হয়েছে—

কর্ম ও কর্মফল

সুকর্ম কুকর্ম হেথা উভয় প্রধান,
তাদের সহযোগে জীব সদা ভাসমান।
একদিকে পূর্ণ শান্তি পূর্ণতার দ্বার,
বিনির্মুক্ত; অন্যদিকে নিরয় অপার।
যার যেদিকে ভার সেদিকে প্রয়াণ,
কর্ম অনুযায়ী গতি নিয়তি বিধান।

তোমরা আপন কর্মে সংযত ও দায়িত্ববান হবে। নিজের দুঃখের জন্য অপর কাউকে দোষ দেবে না। অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। প্রতিদানে তোমাকে ভালবাসবে। কাউকে ঘৃণা করবে না। সর্বদা সত্য ও ধর্মপথ অনুসরণ করবে।

আমরা সুন্দর জীবন গঠন করলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি। পুণ্যবান ও শীলবান ব্যক্তিকে সবাই শুদ্ধি করে। এটা ধার্মিক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে। আর যারা কুকর্মে লিপ্ত হয় তারা সমাজে অবহেলিত ও নিন্দিত হয়। কুকর্মের ফল ইহজীবনে তোগ করতে হয়। তাই কবি বলেছেন-

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ—নরক মানুষেতে সুরাসুর।

সেজন্য বৃদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন। এ চেতনা কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে সংঘটিত হয়। তাই কুশল চিন্ত উৎপন্ন করতে হয়। সৎচেতনা দ্বারা সৎকর্ম উৎপন্ন হয়। কর্ম ও কর্মফল জীবন প্রবাহের অবস্থামাত্র। তাই সুখের ক্ষেত্রে স্বর্গ, দেবলোক, ব্ৰহ্মলোক যেমন রয়েছে, তেমন দুঃখের ক্ষেত্রে রয়েছে তির্যক, প্রেত, অসুর, নরক ইত্যাদি।

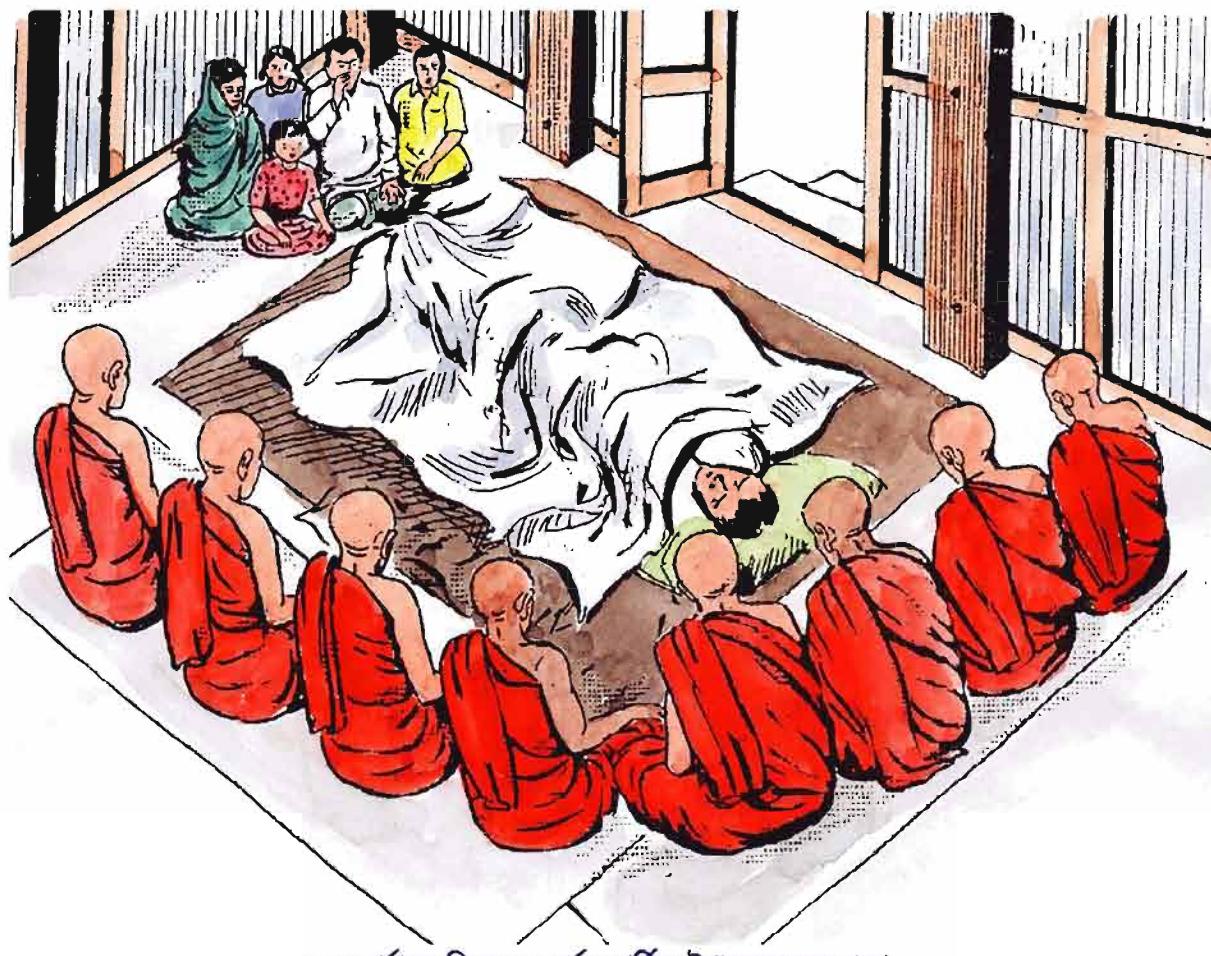
এবার কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে তোমাদের দুটি নীতিগ্নি বলবো। একটি হচ্ছে পুণ্যবান ব্যক্তির কাহিনী এবং অন্যটি হচ্ছে পাপের পরিণাম। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

শ্রাবণ্তীতে একজন ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তিনি সপরিবার সৎপথে জীবনযাপন করতেন। সৎকর্ম করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি সব সময় পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমীতে উপোসথ পালন করতেন। তাঁর গুণাবলি দেখে সবাই মুগ্ধ হত। উপাসক বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা বিহারে যাও।

ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন কর, আমার ধর্মশ্রবণের ইচ্ছা হয়েছে। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। বুদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন। ভিক্ষুগণ উপাসকের বাড়িতে এসে পাশে বসে সুত্র পাঠ আরম্ভ করলেন। উপাসক একগ্র মনে শুনছিলেন। এ সময় ছয় দেবলোক থেকে ছয়জন সারথি রথসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা স্ব স্ব দেবলোকের সুখের বর্ণনা দিয়ে উপাসককে রথে উঠার অনুরোধ জানালেন। উপাসক সারথিকে বললেন— আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি ধর্মশ্রবণ করছি। ধর্ম শ্রবণ শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

‘পাপের পরিণাম’ সম্পর্কে কাহিনীটি শিল্পরূপ:

একদা মৌদ্গল্যায়ন স্থবির রাজগ্রহের গৃহকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসস্থানের পাশে একটি বিরাট অঙ্গার প্রেত বাস করত। তাঁর শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। স্থবির অঙ্গারের অবস্থা দেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন।



মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধার্মিক উপাসকের সুত্র শ্রবণ

কর্ম ও কর্মফল

মৌদ্গল্যায়ন স্থবির বেণুবন বিহারে এসে এ বিষয় বুদ্ধকে জানালেন। তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বললেন।

অজগর প্রেত কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মানব কুলে জন্ম নিয়েছিল। সে অধাৰ্মিক ছিল। দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই সে দুর্বৃত্ত নামে পরিচিত হল। তখন সুমঙ্গল



কষ্টরত অবস্থায় অজগর প্রেত, পাশে ছোট বৃটিরের সামনে মৌদ্গল্যায়ন স্থবির দণ্ডায়মান

নামে এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। দুর্বল শ্রেষ্ঠীর সবকিছু লুষ্টন করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সে পাপের ফলে অজগর প্রেতরূপে জন্ম নিয়ে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ উপদেশ স্বরূপ বললেন:

মুর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে তখন তা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন সে দুষ্কর্মের ফলে নরকে গমন করে তখন অনুত্তাপ করে।

দেখ, সৎকর্মের ফল কী সুখাবহ। দুষ্কর্মের ফল কী ভয়াবহ। তোমরা সবসময় সৎকর্মে রাত থাকবে। তাহলে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে। কখনো খারাপ কাজ করবে না। সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। সত্যধর্ম অনুশীলন করবে। নিজেদেরকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক প্রশ্নের উভয়ের টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. দ্রুষ্টিবাদ | খ. আত্মবাদ |
| গ. কর্মবাদ | ঘ. ক্ষান্তিবাদ |

২. বুদ্ধ চেতনাকে কী বলেছেন?

- | | |
|---------|-----------|
| ক. কর্ম | খ. ধর্ম |
| গ. জন্ম | ঘ. ব্রহ্ম |

৩. কোনটি দুঃখের ভোগান্তি ?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. স্বর্গ | খ. নরক |
| গ. দেবলোক | ঘ. ব্রহ্মলোক |

৪. কোনটি দুষ্কর্মের অন্তর্গত?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. জরা, ব্যাধি | খ. সুখ, আনন্দ |
| গ. জাতি, গোত্র | ঘ. লোভ, দেষ |

কর্ম ও কর্মফল

৫. ধার্মিক উপাসক কোথাকার ছিলেন ?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. রাজগৃহ | খ. শ্বাবস্তী |
| গ. নালপদা | ঘ. বারণসী |

৬. মৌদ্দাল্লায়ন স্থবির রাজগৃহের কোন পর্বতে অবস্থান করতেন ?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. তালকূট | খ. গুধকূট |
| গ. চিরকূট | ঘ. ন্যায়কূট |

৭. ধার্মিক উপাসক মৃত্যুর পর কোন স্বর্ণে জন্ম নিয়েছিলেন ?

- | | |
|---------------|----------|
| ক. তাবতিংস | খ. তুষিত |
| গ. নির্মাণরতি | ঘ. যাম |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কর্মের গতি ও বহুমুখী ।
২. তাই খারাপ কাজকে কর্ম বলা হয় ।
৩. ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য দ্বার খোলা থাকে ।
৪. কর্ম ও কর্মফল জীবন প্রবাহের অবস্থামাত্র ।
৫. তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের বৃত্তান্ত বললেন ।
৬. সৎ ও ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে ।

গ. যাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

যাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. প্রাণীগণ নিজ নিজ ২. খারাপ কাজ করলে ৩. নিজের সুকর্মের জন্য ৪. মুর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে, ৫. মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক ৬. উপাসক বৃদ্ধ বয়সে 	<ol style="list-style-type: none"> ১. নিজেই সুখ ভোগ করে । ২. মানুষেতে সুরাসুর । ৩. মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন । ৪. সবাই নিষ্ঠা করে । ৫. কর্মের অধীন । ৬. তখন তা বুঝতে পারে না । ৭. দেবলোকে নিয়ে যেতে এসেছেন ।

৩. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. কর্মবাদ কাকে বলে?
২. কুশল কর্ম বলতে কী বুঝ?
৩. খারাপ কাজকে কী বলা হয়?
৪. ধার্মিক উপাসক কখন উপোসথ পালন করতেন?
৫. মৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের বাসস্থানের পাশে কে বাস করত?
৬. কে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
২. ‘বৌদ্ধ কর্মবাদ’ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।
৩. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফল বর্ণনা কর।
৪. সুকর্ম ও কুকর্মের পদ্যাখণ্টি উদ্ধৃত কর।
৫. ধার্মিক উপাসকের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬. অঙ্গর প্রেতের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কর।



সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য

ভগবান বুদ্ধ সারনাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সে সময় পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যরা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে ঘশ, সারিপুত্র, মৌদল্যায়ন, উপালি, আনন্দ, অনুরূপ, সীবঙ্গী প্রমুখ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁরা সবাই থের উপাধি লাভ করেন। পটচারা, কৃশা গৌতমী, অনোপমা, পূর্ণিকা, উৎপলবর্ণা, আম্বুপালি ছিলেন থেরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

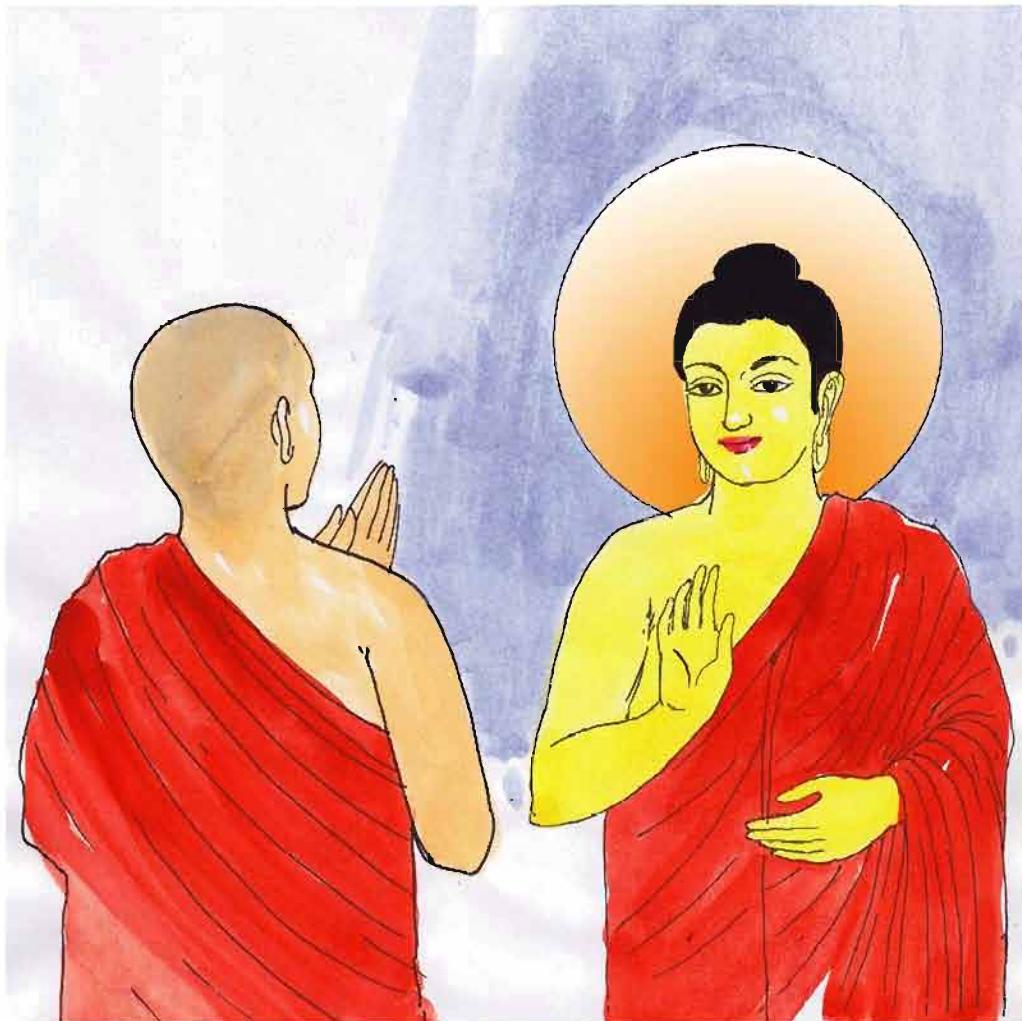
যিনি প্রবীণ ও মার্গফললাভী তাঁকে শ্রাবকশিষ্য বলা হয়। যিনি বয়সে ও জ্ঞানে বড় তিনি থের নামে অভিহিত। মহিলা ভিক্ষুণীকে থেরী বলা হত। শুধুমাত্র ভিক্ষুজীবন যাপন করলেই প্রকৃত থের বা থেরী হওয়া যায় না। যিনি সত্য, ন্যায়, সচরিত্র, অহিংসা, সংযম প্রভৃতি নিয়ম পালন করেন তিনিই প্রকৃত থের বা থেরী। পালি ‘থের’ শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে স্থবির।

যারা গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী উপাসক-উপসিকা তারা গৃহীশিষ্য। গৃহী শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিশ্বসার, প্রসেনজিঙ্গ, অজ্ঞাতশত্রু, জীবক, সম্রাট অশোক, কণিষ্ঠেকর নাম উল্লেখযোগ্য।

আনন্দ স্থবির

বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন আনন্দ। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। তিনি ছিলেন কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ভাই। মাতার নাম জনপদকল্যাণী। সদ্যজ্ঞাত শিশুর দর্শনে জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় ‘আনন্দ’। সিদ্ধার্থ গৌতম যেদিন জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেদিন আনন্দও ভূমিষ্ঠ হন। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের শুভ বৈশাখি পূর্ণিমা তিথিই ছিল উভয়ের জন্মলগ্ন। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কথা শুনে শাক্যকুমারদের অনেকে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ভদ্রিয়, অনুরূপ, আনন্দ, ভৃগু, কিশিল অন্যতম। একথা শুনে দেবদহের রাজপুত্র দেবদত্ত এবং রাজকুলের নাপিত বৎসধর উপালি ও তাঁদের সৎগে যোগ দেন। তখন বুদ্ধ অনুগ্রহ আম্বুকাননে অবস্থান করতেন। তাঁরা এক সঙ্গে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন।

রাজপুত্র আনন্দ ছিলেন ক্ষৌরকার উপালির চেয়ে বয়সে বড়। বুদ্ধ জাতিভেদের বিপক্ষে ছিলেন। তাই তিনি উপালিকে সর্বশ্রদ্ধমে প্রবৃজ্যা দেন। বয়সে যত বড় হোক



বুদ্ধ ও আনন্দ স্থাবির

না কেন, যিনি আগে প্রবর্জিত হন, তাঁকে প্রধাম করতে হয়।

তখন বুদ্ধের কোন ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন না। তাই আনন্দ ৮টি শর্তে বুদ্ধের প্রধান সেবক নিযুক্ত হন। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. বুদ্ধ নিজের প্রাপ্ত চীবর যেন তাঁকে না দেন।
২. স্ত্রীয় লক্ষ্য অন্ন যেন তাঁকে না দেন।
৩. গম্ভীর কুটির বিহারে যেন থাকতে না বলেন।
৪. বুদ্ধ তাঁর গৃহীত নিমন্ত্রণে যেন যান।

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য

৫. নিম্নগে যেন তাকে নিয়ে না যান।
৬. বুদ্ধের নিকট কেউ দেখা করতে চাইলে তিনি যেন দেখা দেন।
৭. যখন তাঁর কোন বিষয়ে সন্দেহ হবে তখন বুদ্ধের নিকট যেন উপস্থিত হতে পারেন।
৮. তাঁর অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলে তা যেন তাকে বলেন।

আনন্দ ছিলেন জ্ঞানী, পঞ্জিত, স্মৃতিধর। বুদ্ধের দেশিত বাণী তিনি স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি প্রথম সংগীতিতে সমগ্র ধর্ম অর্থাৎ সূত্র ও অভিধর্ম আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুরোধে মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ বহু শাক্যনারীকে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তিনি ধর্মভাঙ্গারিক নামে খ্যাত ছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের পরও আনন্দ ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে পরিনির্বাগ লাভ করেন।

অনুরুদ্ধ স্থবির

স্থবির অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের একটি সুন্দর কাহিনী আছে। তিনি পদুমুক্ত বুদ্ধের সময় এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর বারাণসীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় অনুভার। সে সময় তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে চাকুরী করতেন। একদিন তাদের জন্য তৈরি সব খাদ্য একজন পচেক বুদ্ধকে দান করেন। পচেক বুদ্ধ তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রেষ্ঠী সুমন অনুভারের নিকট পুণ্যতাগ দিতে অনুরোধ করলেন। অনুভার তাঁকে পুণ্যদান করলেন। এতে শ্রেষ্ঠী খুশি হয়ে তাঁকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।

একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন রাজদর্শনে গেলেন। সাথে অনুভারও ছিলেন। এ সময় রাজা পুণ্যবান অনুভারকে এক হাজার টাকা পুরস্কৃত করেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য জায়গা দিলেন। সে জায়গা আবাদ করার সময় মাটির নিচে অনেক টাকা পান। এজন্য রাজা তাঁর নাম রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী। তিনি যথাসময়ে দেহত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পর ধনশ্রেষ্ঠী গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় অনুরুদ্ধ। পিতার নাম ছিল অমিতোদন শাক্য। দুঃখময় জীবনে তাঁর এ সুখ বেশিদিন ভাল লাগল না। তিনি সারিপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি সাধনা করতে লাগলেন। পরে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হতফল লাভ করেন।

দান দিলে পুণ্য হয়। পুণ্য প্রভাবে ইহ ও পরজন্মে ধন লাভ হয়। সৎকাজে ব্যয় করলে



অন্নভার জমি চাষ করতে গিয়ে ধনের সম্পর্ক সাড় করেন

প্রভুত মঙ্গল সাধিত হয়। পূণ্যকর্ম পারমী পূরণে সাহায্য করে। অনুরুদ্ধ স্থবিরের জীবন সাধনা সকলের জন্য শিক্ষণীয়।

উৎপন্নবর্ণী

এ নারী পদুমুভুর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল সন্ত্রান্ত। তিনি প্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধের উপদেশ শুনে আনন্দিত হলেন। তখন বুদ্ধ জনেক ভিক্ষুণীকে ঋক্ষিদ্বান হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন। তা দেখে উক্ত নারীর ঐ পদ লাভের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাতদিন ব্যাপী দান দিয়েছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবণ্তীতে শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহ নীল পদ্মের মত ছিল। তাই তাঁকে উৎপন্নবর্ণী বলা হত। প্রাপ্ত বয়সে সমগ্র ভারত থেকে তাঁর বহু

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিয় ও গৃহীণিয়

বিবাহপ্রার্থী আসল। সকলের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি সৎসার ত্যাগ করতে আগ্রহী কিনা?’ শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি এখনই প্রস্তুত। তিনি কন্যাকে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ভিক্ষুণীদের নিকট নিয়ে গেলেন। কন্যা সেখানে ভিক্ষুণী হলেন। পরে সাধনার বলে অর্হতফল লাভ করেন।

তারপর জ্ঞেতবনের সংঘ সম্মেলনে বুদ্ধ তাঁকে খন্দিবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহু গাথা ভাষণ করেন। গাথার একটি অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল:

তৃষ্ণা মানুষকে শুলের মত বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যা ভোগের আনন্দ, আমার
কাছে তা অল্পমাত্র।

তৃষ্ণার বশীভূত হলে মানুষের ক্ষতি হয়। তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। সৎকর্মেরত থাকবে।

পূর্ণিকা

বিপস্সী বুদ্ধের সময় পূর্ণিকা এক সন্তান বৎশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের নিকট ধর্মোপদেশ শুনেন। পরে ভিক্ষুণী হন। নিয়মিত শীল পালন করতেন। ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে বুদ্ধবাণী অনুশীলন করতেন। ফলে তিনি ধর্মের শিক্ষায়ত্রী হলেন। পরবর্তীকালে তিনি আরো পাঁচজন বুদ্ধের নিকট একই পদ লাভ করেন। এজন্য তিনি অভিমান করতেন। এ কর্মফলের দরুণ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবণী নগরে দাসীর গৃহে জন্ম নেন। তাঁর পিতা ছিল অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর কৃতদাস। তাই তিনি দাসীকন্যা রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ধর্মোপদেশ শুনে স্নাতাপন্ন হন। পরে উদকশুদ্ধিক নামে এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সকালে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীতে স্নান করতেন। তাই পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘ব্রাহ্মণ, তুমি কেন নদীতে স্নান করছ?’

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘পূর্ণিকা, আমি পাপকর্মের ফল মোচনের জন্য সৎকর্ম করছি’। স্নানশুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত হয় তা তোমাকে কে বলেছে? যদি তাই হত, তাহলে ভেক, কচ্ছপ, কুমিরাদি ছর্গে যেত। স্নান করলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে দান, শীল, ভাবনায় রত থাকতে হয়।

একথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন: পূর্ণিকা, আমি কুমার্গে পতিত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে

আর্যমার্গ প্রদর্শন করেছে। আমি পূর্বে নামেমত্ত্ব ব্রাহ্মণ ছিলাম। এখন আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলাম।



ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করছেন, কুলে পূর্ণিকা

এরূপ বলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণ গ্রহণ করলেন। শীল পালনে ব্রতী হলেন। উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হলো। তা শুনে অনাথপিডিক শ্রেষ্ঠী পূর্ণিকার পিতাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। পূর্ণিকা সৎস্যে প্রবেশ করে অটিরেই অহিত্বফল প্রাপ্ত হন। তোমরাও আর্যমার্গ অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করবে। সংকর্মে নিজের জীবনকে গড়ে তুলবে। তাহলে সুখী হতে পারবে।

রাজা বিশ্বসার

বুদ্ধের সময় মগধ ও কোশল— এ দুটি রাজ্য শক্তিশালী ছিল। বিশ্বসার মগধের এবং মহাকোশল কোশলের রাজা ছিলেন। রাজা বিশ্বসার মহাকোশলের কন্যাকে বিয়ে করেন। কন্যার বিয়ের সময় মহাকোশল বিশ্বসারকে কাশীগ্রাম উপহার দেন। অজ্ঞাতশত্রু ছিলেন বিশ্বসারের পুত্র।

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীণি

সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে প্রথমে মগধে যন। তখন রাজা বিশ্বিসারের সাথে তাঁর দেখা হয়। বুদ্ধ লাভের পর আগমন করবেন বলে সিদ্ধার্থ রাজাকে বস্থা দিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথ থেকে রাজগৃহে গিয়ে বিশ্বিসারকে দীক্ষা দেন।



বুদ্ধের নিকট রাজা বিশ্বিসারের দীক্ষা গ্রহণ

রাজা বিশ্বিসারের ছী গর্ভবতী হন। রানি যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাঁর নাম রাখা হল অজাতশত্রু। রাজকীয় পরিবেশে ঘোল বছর বয়সে তাঁকে যুবরাজরূপে অভিসন্তু করলেন। পিতা বিশ্বিসার অজাতশত্রুকে সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু অজাতশত্রু পিতাকে কন্দী করে কারাগারেই রাখলেন। রাজা বিশ্বিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধের প্রতি বিশ্বিসারের প্রগাঢ় শুদ্ধি ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সম্বর্মের একজন থাটি ধার্মিক উপাসক। তাঁকে অনুসরণ করে অনেক লোক তথাগত বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে ১৯ বর্ষা যাপন করেন। বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার জীবনে রাজা বিশ্বিসারের অবদান সব চেয়ে বেশি।

রাজবৈদ্য জীবক

জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক। রাজকুমার অভয় ছিলেন তাঁর পিতা। মাতা ছিলেন শালবতী। কথিত আছে, শালবতী তাঁকে প্রসব করার পরই অরশ্যে ফেলে দেন। রাজকুমার অভয় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে দালনপালন করেন। জীবক একদিন কুমার অভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমার মা কে? অভয় বললেন, বৎস, তোমার মা কে তা আমি জানি না। তোমাকে বনের মধ্য থেকে কুড়িয়ে এনেছি। আমি দালনপালন করেছি মাত্র। জীবক বুঝলেন, সে কুমার অভয়ের পুত্র নয়। তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য



বুদ্ধের চিকিৎসক রাজবৈদ্য জীবক

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিক্ষ্য ও গৃহীশিয়

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য তক্ষশিলায় গেলেন। তথায় একজন আচার্যের নিকট গিয়ে বললেন, ‘প্রভু, আমাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিন। জীবকের ব্যবহারে আচার্য মুগ্ধ হলেন। আচার্য খুশি হয়ে জীবককে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। জীবক অল্প সময়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

একদিন আচার্য জীবককে বললেন, ‘আমি তোমাকে চার দিন সময় দিলাম। তুমি এ নগরের চারদিকে ঘুরে এস। কোন গাছটি উষধের কাজে লাগে না, তা এনে দেখাবে’। জীবক আচার্যের আদেশ মত নগরের চারদিকে ঘুরলেন। কিন্তু কোথাও কোন গাছ দেখলেন না, যা উষধ হিসেবে ব্যবহৃত নয়। তিনি আচার্যকে একথা জানালেন। আচার্য বললেন, তোমার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়েছে। আর কিছু করণীয় নেই। তুমি নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কর্তব্য সম্পাদন কর।

জীবক দেশে ফেরার পথে সাকেত নগরে উপস্থিত হলেন। সে নগরে এক ধনী মহিলার শীরপীড়া ভাল করে অনেক টাকা পেলেন। রাজগৃহে ফিরে গিয়ে কুমার অভয়ের পুত্র হিসেবে বাস করতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন এবং রাজবৈদ্য হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উভয়ের পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?

- | | |
|--------------|----------|
| ক. মহাকাশ্যপ | খ. আনন্দ |
| গ. উপালি | ঘ. যশ |

২. আনন্দ কয়টি শর্তে বুদ্ধের সেবক নিযুক্ত হয়েছিলেন?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১০টি | খ. ১৫টি |
| গ. ৮ টি | ঘ. ২৫টি |

৩. অনুরূপ স্থবিরের পিতার নাম কী ছিল ?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. শুদ্ধেদন | খ. ধৌতদন |
| গ. অমিতোদন | ঘ. শুক্রদন |

৪. উৎপলবর্ণ পদমুক্তর বুদ্ধের সময় কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন ?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. কপিলবাস্তু | খ. শ্রাবস্তী |
| গ. কংসবতী | ঘ. হংসবতী |

৫. বিদ্যিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. কোশল | খ. মগধ |
| গ. পাটলিপুত্র | ঘ. উজ্জয়নী |

৬. রাজবৈদ্য জীবকের মাতার নাম কী ?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. শালবতী | খ. লীলাবতী |
| গ. লজ্জাবতী | ঘ. অমরাবতী |

৭. জীবকের আচার্য তাঁকে উষ্ণ আনার জন্য কয়দিন সময় দিয়েছিলেন ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. একদিন | খ. দুইদিন |
| গ. তিনদিন | ঘ. চারদিন |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সে সময় পঞ্চবর্ণীয় শিষ্যরা দীক্ষা নেন।
২. মহিলা ভিক্ষুণীদের বলা হত।
৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরও আনন্দ বছর জীবিত ছিলেন।
৪. তাঁর দেহ নীল মত ছিল।
৫. সিদ্ধার্থ গৌতম করে প্রথমে মগধে যান।
৬. তুমি এ নগরের ঘুরে এস।

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিয়

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সে সময় পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যরা	১. রাজদর্শনে গেলেন।
২. তাই তিনি উপালিকে	২. আশীর্বাদ করলেন।
৩. পচেক বুদ্ধ তাদেরকে	৩. রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী।
৪. একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন	৪. কন্যাকে বিয়ে করেন।
৫. এজন্য রাজা তাঁর নাম	৫. ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন।
৬. রাজা বিন্ধিসার মহাকোশলের	৬. সর্বপ্রথম প্রবৃজ্যা দেন।
	৭. গৃহ ত্যাগ তরেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. কয়েকজন থের-থেরীর নাম লেখ।
২. শ্রাবকশিষ্য কাকে বলে?
৩. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?
৪. পূর্ণিকা কোন বুদ্ধের সময় সন্ত্বান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
৫. রাজা বিন্ধিসার কার কন্যাকে বিয়ে করেন?
৬. জীবক আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আনন্দ স্থবিরের জীবনী আলোচনা কর।
২. অনুরূপ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনীটি বর্ণনা কর।
৩. উৎপলবর্ণার সংসার ত্যাগের কারণ প্রদর্শন কর। তিনি কীভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন?
৪. পূর্ণিকা কে ছিলেন? পূর্ণিকা ও উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৫. রাজা বিন্ধিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. চিকিৎসা শাস্ত্রে জীবকের ভূমিকা আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

জাতকের শিক্ষা

জাতক

সাধারণ অর্থে জাতক বলতে যে জনগ্রহণ করেছে তাকে বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্তকে জাতক বলা হয়। এক কথায় জাতক বুদ্ধের পূর্বজন্মের বিচিত্র কথা ও কাহিনী।

বুদ্ধ ধর্ম দেশনা কালে উদাহরণ স্বরূপ জাতক কাহিনীগুলো বলতেন। বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্গকুর রূপে তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। অনেক কুশল কর্ম করে শেষ জন্মে পূর্ণজ্ঞান বা বুদ্ধস্তু লাভ করে বুদ্ধ হন।

পালি সাহিত্যে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। জাতক পালি ভাষায় রচিত। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুস্ত পিটকের খুদক নিকায়ের একাদশ গ্রন্থ হলো জাতক।

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা সর্বজনীন। জাতক কাহিনীগুলো অতি চমৎকার। সদাচারণ, জীবে দয়া, মৈত্রী, করুণা, মহানৃত্বতা, সাধুতা, নৈতিকতা, সেবা, শিষ্টাচার, সংযম, মানবতা ইত্যাদি জাতক সাহিত্যের উপদেশ। কুশল কর্ম বা পথ অবলম্বন করে মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন করা জাতকের মূল শিক্ষা।

বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানের সময় জাতকের নানা কাহিনীর বর্ণনা করতেন। জাতকের ঘটনাগুলো বোধিসত্ত্ব জীবনের সময়কালের। বোধিসত্ত্বের নানা জন্ম ও পারমী পূরণের অবিচল প্রচেষ্টার কথাই জাতকের শিক্ষা। জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য মণিরত্নের মতো।

জাতকের উপদেশ মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, করুণা আর ভালবাসার ক্ষম্বন ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। এগুলো মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। জাতকের উপদেশের মধ্যে মানুষের জীবনাচার, পেশা এবং সমাজের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ন্যায়-অন্যায় বোধ জগত করা এবং কুসংস্কার পরিহার করা জাতকের শিক্ষা।

জাতকের শিক্ষা

জাতক পাঠের উদ্দেশ্য

জাতক পাঠে অনেক কিছু জানা যায়। সাধারণত সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল বর্ণনা করাই জাতকের উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ মতে, এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাংকুর রূপে অসংখ্য কল্পকাল ধরে নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল জন্মে দান, শীল, মৈত্রী, সেবা, কৃশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পারমী পূরণ করে বুদ্ধ হন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সৎ কর্ম, ভাল-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে জাতক বলতেন। মৈত্রী সাধনা ও কৃশলকর্ম বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। জাতক পাঠ মূলত শিষ্য ও প্রশিষ্যদের সঠিক পথে চলা, ভাল কাজ করা, সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি, পরোপকার করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া ইত্যাদির শিক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নির্বাগের পথে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা লাভ করা।

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সকলের কাছে জাতক পাঠ গুরুত্ব লাভ করেছে। জাতকের প্রভাব সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান। প্রাচীন কালের ইশ্পের গল্প ও ডেকামেরনে জাতকের প্রভাব পাওয়া যায়। আরব্য রাজনীর কাহিনীতেও জাতকের প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যেমন— বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিঙ্গাম ইত্যাদি। এমনকি ইহুদি সাহিত্য ও বাইবেলেও জাতকের প্রভাব রয়েছে।

জাতকের ঐতিহাসিক মূল্য অত্যধিক। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান জাতকে রয়েছে। আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি জাতকে বর্ণিত আছে। জাতক সাহিত্যে বিভিন্ন রাজ্য, নগর, কন্দর, রাজন্যবর্গ, শ্রেণি, বণিক, বিহার, নদ-নদী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন— কোশল, বৈশালী, মগধ, রাজগৃহ, শ্রাবণ্তী, বারাণসী প্রভৃতি। আবার রাজাদের মধ্যে প্রসেনজিৎ, বিন্দিসার, উদয়ন, অজাতশত্রু প্রমুখ রাজার নাম পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ধনঞ্জয়, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ। জাতকের নানা দিক বিবেচনা করে ভিনসেন্ট, স্থিথ, রিসডেভিড, ফৌসবল প্রমুখ ইতিহাসবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম রত্নভাণ্ডার বলে

অভিহিত করেছেন। তাই বলা যায় জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।
জাতক সাহিত্যের আলোকে তোমরা এবার কয়েকটি জাতক কাহিনী এবং উপদেশ সম্পর্কে
জানতে পারবে।

মহাধর্মপাল জাতক

প্রাচীন কালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদণ্ড। তখন কাশীরাজে ধর্মপাল নামে একটি গ্রাম
ছিল। এই গ্রামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন দশ কুশল ধর্ম
আচরণকারী। তাঁকে লোকে বলত ধর্মপাল। তাঁর পরিবারের সব লোক ও দাস-দাসীরা
পর্যন্ত দানশীল পরায়ণ ছিলেন। তারা শীল ও উপবাস ব্রত পালন করত।

বোধিসত্ত্ব এই বৎশে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পুত্রুপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো
ধর্মপাল কুমার। তিনি বয়প্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় এক
আচার্যের কাছে পাঠালেন। আচার্যের পাঁচগত শিষ্য ছিল। ক্রমে বোধিসত্ত্ব সেই সব
শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

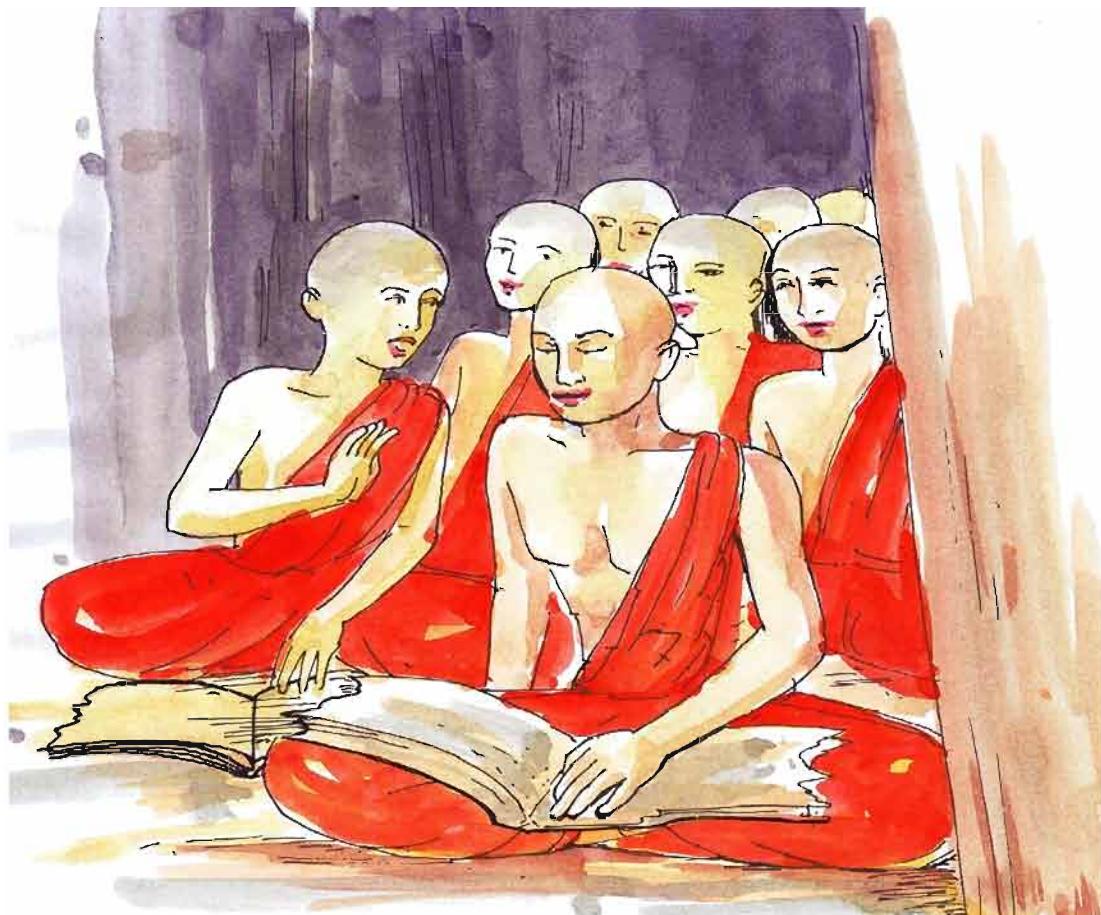
একদিন আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হল। আচার্য, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ছাত্ররা
সকলে কান্না করতে লাগলেন। একমাত্র ধর্মপাল কুমার বোধিসত্ত্ব রোদন করলেন না।
তিনি শুধু হাসলেন।

আচার্য ধর্মপালকে হাসার কারণ কী জানতে চান। তখন ধর্মপাল বলল, তাঁর বৎশে কেউ
তরুণ বয়সে মারা যায় না। এ কথার সত্যতা জানতে আচার্য একদিন একটি মৃত ছাগলের
অস্থি নিয়ে ধর্মপালের বাড়ি গেলেন। ধর্মপাল মারা গেছে বলে আচার্য তাঁর পিতাকে বলল।
কিন্তু ধর্মপালের পিতা বিশ্঵াস করলেন না। তখন আচার্য ছাগলের অস্থি দেখিয়ে বলল, এ
অস্থি ধর্মপালের। ধর্মপালের পিতা কোন মতে বিশ্বাস করল না। তখন আচার্য সত্যতা
স্বীকার করল।

আচার্য এবার প্রসন্ন হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র জীবিত আছে। সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ
শিষ্য এবং তারই উপর আমার অন্য সব শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়ে আমি এখানে
এসেছি। আপনার পুত্র আমাকে বলেছে, আপনার বৎশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না।
আমি তখন আপনার কাছে তার কারণ জানতে চাই। এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ যে যে গুণের
প্রভাবে তাঁর বৎশে অকাল মৃত্যু হয় না তাঁর গুণগুলো বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, আমরা
সৎ ও অসৎ ধর্মের কথা শুনে কখনো আসন্ত হই না। অসৎকে ত্যাগ করে, সদা সর্বদা সৎ
এর ভজনা করি। তাই আমাদের বৎশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না।

জাতকের শিক্ষা

দানের পূর্বে আমাদের মন সুপ্রসন্ন থাকে। শ্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করি। দানের পর আমরা কোন অনুত্তাপ করি না। তাই তবুণের মরণ হয় না। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পথিক, যাচক, দরিদ্র, ভিখারী, দ্বারস্থ হলে তাদের আহার ও পানাহারে তুষ্ট করি। সাধ্যমত তাদের দান করি।



আচার্যের পাঠশালায় ধর্মপাল ও সহপাঠীবৃন্দ

আমাদের বৎশের স্বামীরা সতীত্বত, স্তুরা পতিত্বতা। সমগ্রণে ব্রহ্মচর্য পালন করি। এ বৎশের সতী স্তুর গর্ভে যে সন্তান জন্মায় সে মেধাবী, ধার্মিক, প্রজ্ঞাবান, সর্বশান্তিবিদ ও দেবপরায়ণ হয়। মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভের আশায় সকলেই ধর্মপথে বিচরণ করে। যে দাস-দাসী আশ্রিত আছে তারাও ধর্মপথে চলে।

এরপর ব্রাহ্মণ বললেন, যে ধর্মপথে চলে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। বর্ষা ও ঝৌড়ে ছাতা

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

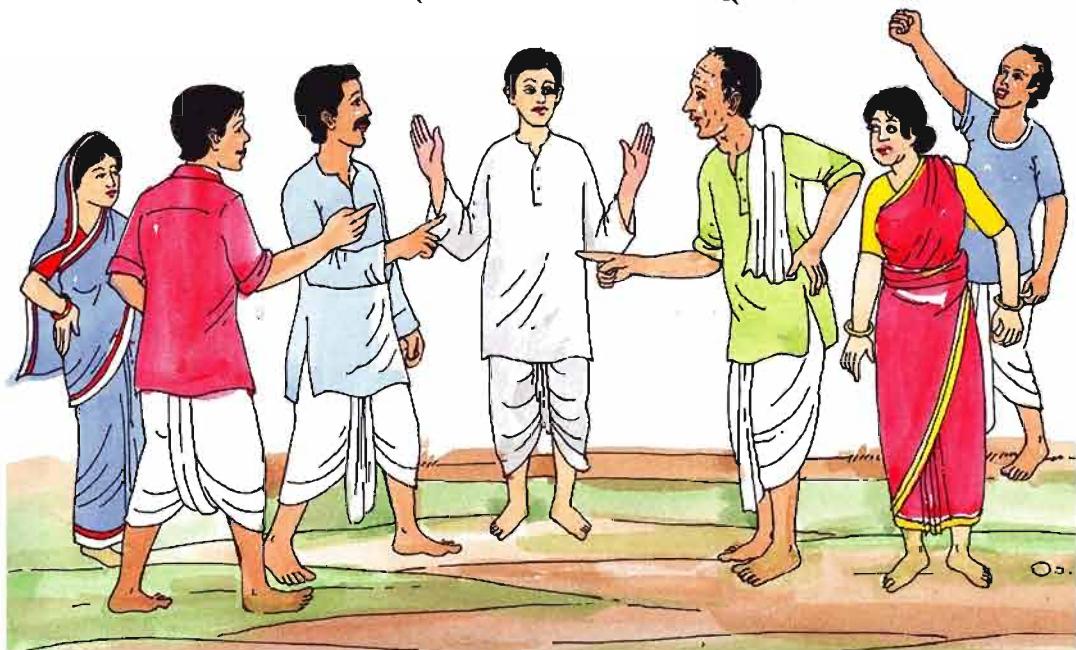
যেমন মানুষকে রক্ষা করে তেমনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে। ধার্মিকের কথনে অকল্যাণ হয় না। তাই বলি আপনি যে অস্থি এনেছেন, তা অন্য কারো। আমার পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হতে পারে না। এ কথা শুনে আচার্য পরমপ্রীত হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য ছাগ অস্থি এনেছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। এখন আপনি যে ধর্ম রক্ষা করেন সেই কথাগুলো অনুগ্রহ করে বলুন।

আমরা আর্যধর্ম পালন করি, চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকর্মণ, ব্রহ্মবিহার, উপোসথ ব্রত, পঞ্চশীল পালন করি। আচার্য কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে তক্ষশিলায় ফিরে গেলেন। তারপর ধর্মপাল কুমারকে সমস্ত বিদ্যা দান করে তাকে বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

উপদেশ : ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে।

নক্ষত্র জ্ঞাতক

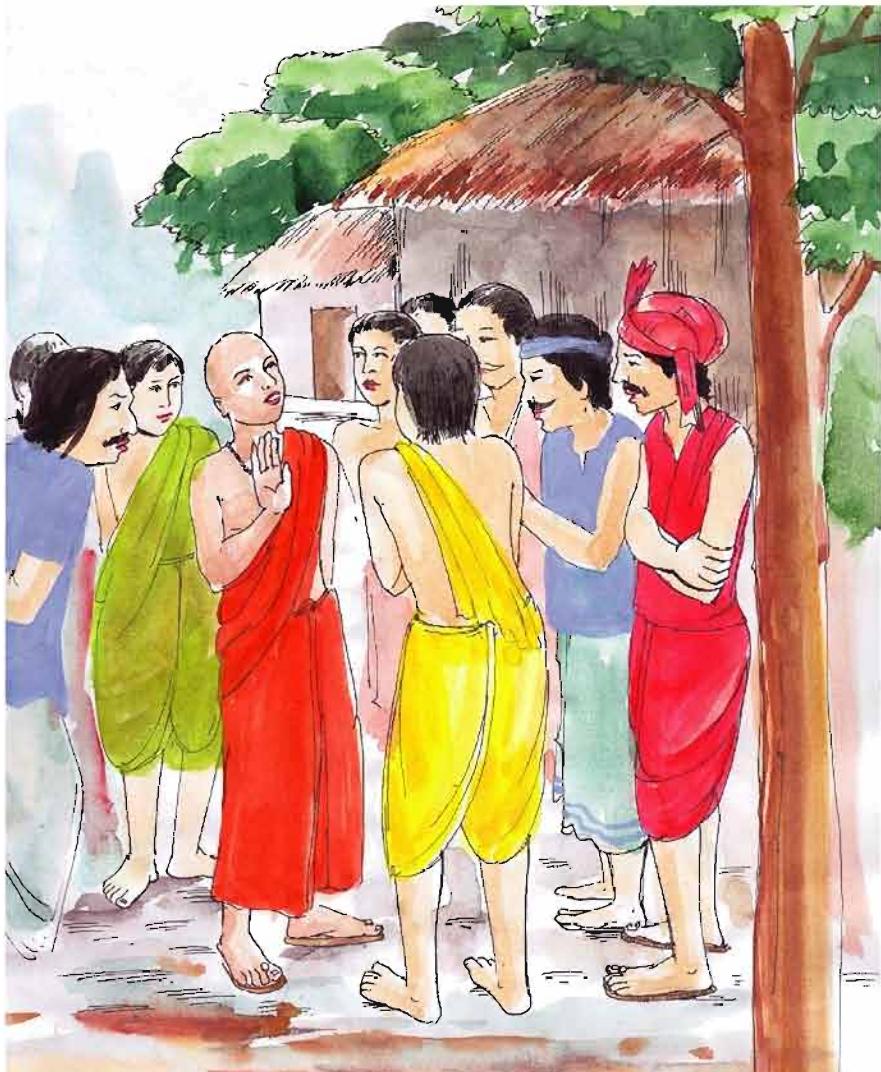
প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে এ জাতকের ঘটনাটি ঘটেছিল। বারাণসী নগরের লোকেরা তাদের এক পাত্রের সাথে জনৈক গ্রামবাসীর মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন। আজীবক নামে নগরবাসীদের এক কুলগুরু ছিলেন। তাঁর নিকট গিয়ে নগরবাসীরা বলল, প্রভু, আজ আমাদের একটি শুভ কাজ আছে।



বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিবাহ লগ্নের শুভ-অশুভ নিয়ে বিতর্ক

জাতকের শিক্ষা

এখানকার এক
কুলপুত্রের সাথে এক
গ্রামবাসী মেয়ের বিয়ে
ঠিক হয়েছে। নক্ষত্র লগ্ন
শুভ হবে কি? আজীবক
মনে মনে অসম্ভুষ্ট
হলেন। তাবলেন,
বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক
করে এরা লগ্ন শুভ কিনা
জানতে এসেছে। আগে
জানার প্রয়োজন বোধ
করেনি। তাই বিয়ের
অনুষ্ঠান পঞ্চ করার জন্য
বললেন, আজ নক্ষত্র
লগ্ন মোটেই শুভ নয়।
বিয়ে সম্পন্ন হলে
অঙ্গজল হবে।
নগরবাসীরা ঠার কথায়
বিশ্বাস করে ঐদিন পাত্রী
আনতে গেল না।



ଏଦିକେ ଗ୍ରାମବାସୀରା
ସାରାଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରଲ ।
ରାତ ହେଁ ଏଲୋ । ତବୁ କର
ବରେର ସାଥେ କନେର ବିଯେ ।

বোধিসত্ত্ব এসে বরপক্ষ ও পাত্রাপক্ষের মধ্যে বিতর্ক ঘটিছেন

ପରଦିନ ପାତ୍ରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ଆନତେ ଗେଲେ ଭୀମଣ କ୍ଷେପେ ଗିଯେ ଗ୍ରାମବାସୀରୀବା ବଲଳ, ତୋମରା ନଗରବାସୀରୀବା ବଡ଼ଇ ନିର୍ଜଞ୍ଜ । ଦିନକ୍ଷଣ ସବ ଠିକ କରେ ଗତକାଳ ପାତ୍ରୀ ନିତେ ଏଥେ ନା । ତାଇ ଆମରା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେର ସାଥେ କନ୍ୟା ସମସ୍ତଦାନ କରେଛି । ଏଥିନ ସେହି ବିବାହିତ ମେଯେ ଏନେ ତୋମାଦେର ଦେଉୟା ସମ୍ଭବ ନୟ । ତୋମରା ଫିରେ ଯାଓ ।

বরপক্ষ বলল, আমাদের কুলগুরু আজীবকের নেকট জানশাম, গতকাল নক্ষত্র শুণু শুভ ছিল

না। বিয়ে হলে অমঙ্গল হবে। এজন্য আমরা আসিনি। এখন পাত্রী না নিয়ে ফিরে যাব কেন?

এভাবে উভয়পক্ষে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। পাশে দাঢ়িয়ে বোধিসত্ত্ব সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, নক্ষত্র লগ্ন শুভ কি অশুভ তাতে কি এসে যায়? মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে। যথাসময়ে কাজ সম্পাদন করে সুফল অর্জনই শুভ লক্ষণ। শুভ কাজে নক্ষত্রের কোন যোগ নেই। নক্ষত্র মেনে চলতে গেলে নিজেদেরই কাজের ক্ষতি হয়। যেমন— বরপক্ষের ক্ষতি হল।

বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনে উভয়পক্ষ শান্ত হল। বরপক্ষ পাত্রী ছাড়া বিষণ্ণ মনে নগরে ফিরে গেল।

উপদেশ : শুভ কাজের কোন কালাকাল নেই

কূটবাণিজ জাতক

সুদূর অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদণ্ডের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ‘পণ্ডিত’। বড় হয়ে ‘অতিপণ্ডিত’ নামে বণিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরা দু’জনে পাঁচশ পণ্য বোঝাই গাঢ়ি নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান। ক্রয়-বিক্রয় করে অনেক লাভবান হন কিছুদিন পর বারাণসী নগরে ফিরে আসেন।

ব্যবসায় লভ্যাংশ নিয়ে তাঁদের দু’জনের মধ্যে ঝাগড়া হয়। অতিপণ্ডিত বললেন, আমি দু’ভাগ নেব, তুমি এক অংশ পাবে। পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাস করলেন, কেন? পণ্যের মূল্য, গাঢ়ি, বলদ সবকিছু আমরা দু’জনে সমান দিয়েছি। উভয়ে অতিপণ্ডিত বললেন, তুমি শুধু পণ্ডিত বলে এক ভাগ, আর আমি অতিপণ্ডিত দু’অংশ। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হল। অবশেষে অতিপণ্ডিত মীমাংসার একটি উপায় বের করলেন। কিন্তু এটা ছিল তার দুষ্টবুদ্ধি। তিনি তাঁর পিতাকে এক বৃক্ষের কোটরে রাখলেন। বললেন, আমরা দু’জনে এসে কে কত ভাগ পাব জিজ্ঞাসা করব।

এক সময় তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে বৃক্ষদেবতার প্রশংসা করে বললেন, ঐ বৃক্ষদেবতা ভূতভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করা হয় তা লাভ করা যায়। কোন বিবাদ দেখা দিলে তাও মীমাংসা

জাতকের শিক্ষা

করতে পারেন। বৃক্ষদেবতার সব জানা আছে। চল ভাই, আমরা তাঁর নিকট গিয়ে ঝগড়া নিষ্পত্তি করি। আমরা কে কত ভাগ পাব তা হাচাই করি।



বৃক্ষ কোটরে ধূর্ত বণিকের পিতা এবং আগুনের ফুলকি

সেভাবে তাঁরা দুজন বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হলেন। অতিপিণ্ডিত প্রার্থনা করলেন, হে ভগবানসদৃশ বৃক্ষদেবতা আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আমরা সমস্যায় পড়েছি। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। তখন অতিপিণ্ডিতের পিতা বললেন, তোমাদের বিবাদ কী নিয়ে বল? তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অতিপিণ্ডিত সবিনয়ে বললেন, প্রভু আমরা দু'জনে একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলাম। দূর-দূরান্তে অনেক কষ্ট করেছি। আমি বন্ধুত্ব ছিল করতে চাই না। এখন আপনিই মধ্যস্থতা করুন। আমাদের মধ্যে লভ্যাংশের কে কত ভাগ পাবে? বৃক্ষ কোটর থেকে উত্তর এলো। পিণ্ডিত এক ভাগ, অতিপিণ্ডিত দু'ভাগ পাবে। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমার উপদেশ মতো অংশ ভাগ করে নেবে।

বৌদ্ধিসত্ত্ব এ বিচার শুনে বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলেন। ভাবলেন এখানে দেবতা আছে কিনা জানতে হবে। তিনি খড়কুটা সংগ্রহ করলেন। বৃক্ষের কোটরপূর্ণ করে অগ্নি সংযোগ করলেন। দাউ দাউ করে আগুন ঝঁলে উঠল। ধূর্ত বণিকের পিতা অর্ধাঙ্গ শরীরে বৃক্ষকোটর থেকে বের হয়ে এলেন। সমস্ত শরীর বালসে গেল। শাখা ধরে তিনি নিচে নামলেন। নামবার সময় ধূর্ত বণিকের পিতা বৌদ্ধিসত্ত্বের প্রশংসা করে বললেন-

সার্থক পিণ্ডিত নাম ধর তুমি সাধুবর,
নাহি এতে সন্দেহের লেশ;
অতিপিণ্ডিত নিরীক্ষক হায়, হায় !
তারি দেখে এত মোর ক্লেশ।

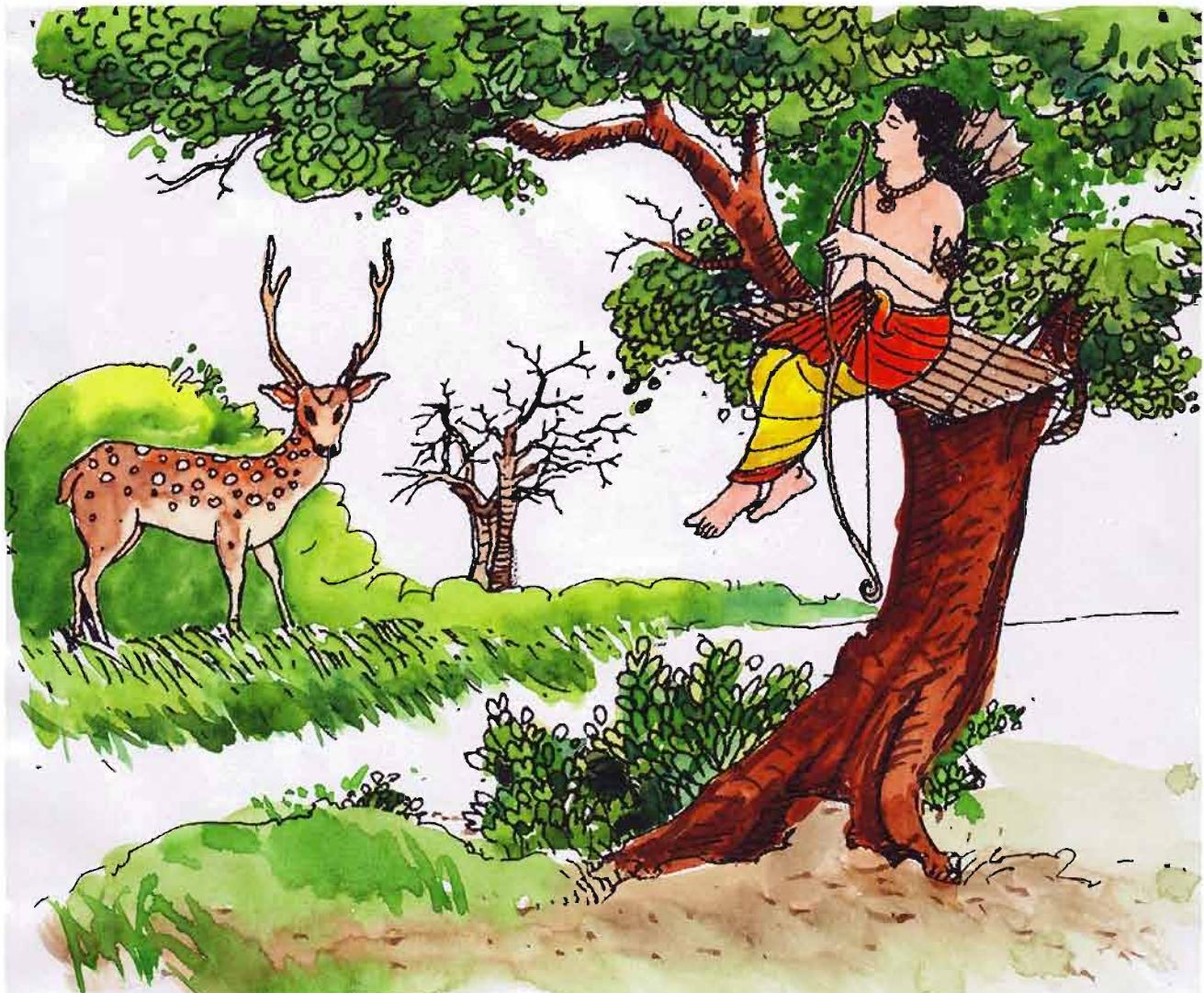
অতিপিণ্ডিতের পিতা অসহ্য যন্ত্রণা ও মনের দুঃখে নিজ পুত্রকে ভৎসনা করলেন। বৌদ্ধিসত্ত্বের গুণকীর্তন করে বাঢ়ি চলে গেলেন। অতিপিণ্ডিত নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে। পিতাকে অপমান ও কষ্ট দিয়ে বৌদ্ধিসত্ত্বের কাছে হার মানলেন। অবশ্যে দু'জনে সমান লভ্যাংশ ভাগ করে নিলেন।

উপদেশ : কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বাঞ্ছিত করা উচিত নয়।

কুরঙ্গমৃগ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদণ্ডের সময় বৌদ্ধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বনে ফল খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। সেই বনে ছিল একটি বড় ছাতিম গাছ। বৌদ্ধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের ফল খেত। সে সময় বনের পাশের এক গ্রামে এক ব্যাধি বাস করত। সে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই ছাতিম গাছের ডালে মাচা বেঁধে শিকারের অপেক্ষায় থাকত। হরিণেরা তা বুঝতে না পেরে ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিত। ব্যাধ সেই হরিণের মাংস বিক্রি করে জীবন ধারণ করত।

জাতকের শিক্ষা



গাছের উপরে বসা শিকারী ব্যাধ এবং ছাতিম গাছের পাশে হরিণ বোধিসত্ত্ব

একদিন সেই ছাতিম গাছের শাখায় মাচাট ওপর বসে ব্যাধ বোধিসত্ত্বের জন্য অপেক্ষা করছিল। বোধিসত্ত্ব সেদিন সকালে ছাতিম গাছের দিকে যাওয়ার সময় ভাবলেন, সময়ে সময়ে ব্যাধরা গাছের ওপর মাচা বেঁধে ওঁৎ পেতে থাকে। কাজেই আমারও উচিত ছাতিম গাছে কোন ব্যাধ আছে কি না পরীক্ষা করা। এ জন্য বোধিসত্ত্ব সাবধানে দূর থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ব্যাধ দেখল, বোধিসত্ত্ব গাছের নিচে আসছেন না। তাই ব্যাধ ছাতিমের শিম ছিড়ে বোধিসত্ত্বের দিকে ছুঁড়ে মারছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বুঝলেন এ গাছে নিচয়ই ব্যাধ আছে। তা না হলে শিমগুলো ছুঁড়ে মারবে কে?

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

কাজেই বৌদ্ধিসন্তু গাছের দিকে বারবার ভালো করে দেখতে লাগলেন। শেষে তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে ব্যাধকে দেখতে পেলেন। বৌদ্ধিসন্তু ব্যাধকে দেখেও না দেখার ভান করে বললেন, হে গাছ, এতদিন তুমি ছাতিমের শিমগুলো ওপর থেকে সোজা নিচের দিকে ফেলতে। আজ তুমি ছুঁড়ে মারছ কেন? আজ তুমি আমার পরিচিত গাছের মত ব্যবহার করছ না কেন? কাজেই তুমি যখন তোমার স্বভাব ধর্ম মত কাজ করছ না আমি অন্য কোন গাছের নিচে চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার খাবার জোগাড় করি।

এই বলে বৌদ্ধিসন্তু চলে যাওয়ার উপকূল এমন সময় ব্যাধ তীর নিক্ষেপ করল। সেই তীর বৌদ্ধিসন্তুর গায়ে লাগল না। তখন ব্যাধ বলল, দূর হও, আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পেলে।

বৌদ্ধিসন্তু বললেন, আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পেলাম বটে। কিন্তু তুমি মহানরক থেকে রেহাই পাবে না। তোমাকে হিংসা, লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি পাঁচ রকম যাতনা ভোগ করতে হবে। এই বলে বৌদ্ধিসন্তু সেখান থেকে চলে গেলেন। ব্যাধও গাছ থেকে নেমে অন্য জায়গায় চলে গেল।

উপদেশ : বুদ্ধিমান ও সাবধানের মার নেই।

কালকণ্ণী জাতক

অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন বৌদ্ধিসন্তু একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠীর কালকণ্ণী নামে এক মিত্র ছিল। এই কালকণ্ণী ছিল তাঁর শৈশবের খেলার সাথী। পরে কালকণ্ণী কোন কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধিসন্তুর কাছে সাহায্য চায়।

বৌদ্ধিসন্তু তখন তাকে তাঁর সম্পত্তি ও বাড়ি ঘর দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে কালকণ্ণী তাঁর কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে লাগল।

কালকণ্ণী শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে আসার পর থেকে ‘কালকণ্ণী দাঁড়াও, কালকণ্ণী বস, কালকণ্ণী যাও’ এই সব কথা প্রায় শোনা যেত। তখন শ্রেষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবগণ বিরক্ত হয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার বাড়ি থেকে কালকণ্ণীকে সম্বোধন করে দাঁড়াও, বস, খাও, এসব কথা শোনা যায়। এসব ভাল দেখায় না। আপনি তার সঙ্গ ত্যাগ করুন। বৌদ্ধিসন্তু উত্তরে বললেন, ‘দেখ, নাম বস্তু নির্দেশ করে পওতেরা কোন বস্তু বা

জাতকের শিক্ষা



কালকণী শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রাতে ডাকাতদল

ব্যক্তির গুণ বিচার করেন না। কোন নাম শুনেই অমঙ্গল আশংকা করা উচিত নয়। আমি নামের উপর নির্ভর করে আমার শৈশবের সাধী বাল্য বন্ধুর প্রতি বিমুখ হব না।’

শ্রেষ্ঠী বৌধিসন্দের একটি ভোগ গ্রাম ছিল। অর্ধাত তাঁর ভোগের জন্য রাজা এই গ্রামটি তাঁকে দান করেছিলেন। একদিন তিনি কালকণীর হাতে গৃহস্থার ভার দিয়ে সেই গ্রামে চলে গেলেন। তখন চোরেরা ভাবল, এখন শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই। এই সুযোগে আমরা তাঁর বাড়ি থেকে সর্বস্ব চুরি করব।

এই ভেবে তারা সেদিন রাতে অন্তশ্বন্ত নিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাড়ি ঘিরে ফেলল। এদিকে কালকণী আগেই সন্দেহ করেছিল, আজ রাতে চোরেরা আসতে পারে। তাই সে সেই রাতে না ঘুমিয়ে জেগে বসে ছিল। যখন সে বুবাতে পারল দস্যুরা বাড়ির চারদিকে জড়ে হয়েছে, তখন সে পাড়া প্রতিবেশিদের জন্য ‘শাখ বাজাও, দামামা বাজাও’ বলে চিৎকার করতে লাগল। সে সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে তালপাড় করতে লাগল।

দস্যুরা তা দেখে ভাবল, শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই একথা সঠিক নয়। বাড়িতে অনেক লোক জেগে আছে। বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরে এসেছেন। এক্ষেত্রে বাড়ি লুট করা সম্ভব নয়।

তখন তারা হতাশ হয়ে পাথর, লাঠি প্রভৃতি অন্ত ফেলে রেখে চলে গেল। পরদিন সকালে পাড়ার লোকেরা দস্যুদের ফেলে যাওয়া অন্ত দেখে বুবাতে পারল; গত রাতে চোর এসেছিল। তারা ভয় পেয়েছিল। তারা তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল, কালকণীর মত বুদ্ধিমান লোক না থাকলে দস্যুরা শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদ চুরি করে নিয়ে যেত। শ্রেষ্ঠীর ভাগ্য খুব ভাল যে এমন বিশ্বাসী লোক পেয়েছেন।

এমন সময় শ্রেষ্ঠী বৌধিসন্ত্ব ভোগ গ্রাম হতে ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি তখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বললেন, তোমাদের কথা শুনে যদি এমন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তখন তাড়িয়ে দিতাম তাহলে চোরেরা আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত।

এরপর তিনি একটি গাথা পাঠ করে তাদের ধর্মোপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, যার সঙ্গে সাত পা চলা হয় তাকে মিত্র বলতে হয়। যার সঙ্গে বারো দিন বাস করা হয় তাকে সখা বলা হয়। যার সঙ্গে এক পক্ষ বা একমাস বাস করা হয় সে হচ্ছে জ্ঞাতির সমান। যার সঙ্গে বেশি ভাব, যার সঙ্গে একান্তে বাস করা হয় সে হচ্ছে বন্ধু। আআ সুখের জন্য আমার শৈশবের বন্ধুকে কি ত্যাগ করতে পারি?

এই বলে সকলকে উপদেশ দিলেন বৌধিসন্ত্ব।

উপদেশ : বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উভয়ের টিক চিহ্ন (✓) দাও।

১. জাতকের মূল শিক্ষা কী?

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ক. বিনয় সম্ভব জীবনগঠন | খ. পরিপূর্ণ জীবন গঠন |
| গ. অর্থনৈতিক জীবন গঠন | ঘ. মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন |

২. ভারতীয় সাহিত্যে কিসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

- | | |
|----------------|-----------|
| ক. সুভ্রান্তিক | খ. জাতক |
| গ. ত্রিপিটক | ঘ. ধর্মপদ |

৩. ধর্মপাল কুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. তক্ষশিলা | খ. বিক্রমশীলা |
| গ. নালন্দা | ঘ. ময়নামতি |

৪. অতি পাঞ্চিত বিবাদ মীমাংসার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক. অতিবুদ্ধি | খ. সুবুদ্ধি |
| গ. দুষ্টবুদ্ধি | ঘ. উপস্থিত বুদ্ধি |

৫. আজীবক মনে মনে কী হলেন?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. সন্তুষ্ট | খ. অসন্তুষ্ট |
| গ. শান্ত | ঘ. রাগান্বিত |

৬. ব্যাধ গাছের ডালে কী শিকারের অগ্রেক্ষায় থাকত?

- | | |
|---------|---------|
| ক. হরিণ | খ. বাঘ |
| গ. ছাগল | ঘ. পাখি |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সংগৃহীত হয়।
২. জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য মতো।
৩. সার্থক পাঞ্চিত নাম ধর তুমি।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৪. দানের পূর্বে আমাদের মন থাকে।
৫. শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধিসত্ত্বের একটি গ্রাম ছিল।
৬. বিপদে প্রকৃত পরিচয় হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. জাতকের উপদেশ ও ২. এক জন্মের কর্মফলে কেউ ৩. তুমি শুধু পঞ্চিত বলে এক ভাগ, ৪. মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ ৫. যে ধর্মপথে চলে ৬. বৌদ্ধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের 	<ol style="list-style-type: none"> ১. অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে। ২. ধর্মই তাকে রক্ষা করে। ৩. ফল খেতে। ৪. শিক্ষা সর্বজনীন। ৫. আমি অতিপঙ্চিত তাই দু'ভাগ। ৬. বুদ্ধ হতে পারে না। ৭. জাতকের প্রভাব পড়ে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. জাতক কাকে বলে?
২. জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী?
৩. ধর্মপাল কুমারের আচার্য কিসের অস্থি নিয়ে গিয়েছিল?
৪. অতিপঙ্চিতের শঠতা কীভাবে ধরা পড়েছিল?
৫. নক্ষত্র জাতকের উপদেশ কী?
৬. শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধিসত্ত্ব বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ কর।
২. মহাধর্মপাল জাতক মতে তরুণ বয়সে মৃত্যু না হওয়ার গুণগুলো লেখ।
৩. নক্ষত্র জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।
৪. ‘কাটকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়’ – এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৫. কালকণী কীভাবে শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধিসত্ত্বের ধনসম্পদ রক্ষা করেছিল? আলোচনা কর।
৬. উপদেশসহ কুরঙ্গমৃগ জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ । ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୁଦ୍ଧେର ଶିଷ୍ୟଦେର ସୃତି ବିଜଡ଼ିତ ତୀର୍ଥ, ମହାତୀର୍ଥ, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଲୋ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଡେମରା ପୂର୍ବେ ତୀର୍ଥ ଓ ମହାତୀର୍ଥ ସମ୍ପର୍କେ ଜେନେହ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାନତେ ପାଇବେ ।

ବୌଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏକଟି ସୁପ୍ରାଚିନ ଧର୍ମ । ଏ ଧର୍ମର ଅନେକ ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂକ୍ଷିତି ରଯେଛେ । ବିଶେଷ କରେ ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ, ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀଦେର ସୃତି ବିଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକେ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ବଲେ । ଆବାର ଏସକ୍ଲ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ସବ ପ୍ରତ୍ନବସ୍ତୁ ପାଓଯା ଗେଛେ ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଲା ହୁଏ । ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ।

ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂକ୍ଷିତି ହଳ ଏକଟି ଜାତିର ମୂଳ ଶୈଖରଣ । ଜାତିର ଇତିହାସ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରେ ସଂକ୍ଷିତି । ଫା-ହିୟେନ, ହିଉୟେନ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଚୀନା ପର୍ଯ୍ୟକେରା ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ସଂକ୍ଷିତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଇତିହାସେର ବିବରଣ ଲିଖେ ଗେଛେ । ବୌଦ୍ଧ ବିହାରଗୁଲୋ ସେକାଳେ ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଂକ୍ଷିତି ଚର୍ଚାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଛିଲ ।

ବୌଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ

ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଇତିହାସେର ଏକ ପରମ ସମ୍ପଦ । ବୌଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ହଲୋ ଗୌରବମୟ ସୃତି ଓ ସଟନା ବିଜଡ଼ିତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଇହା ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଶିଷ୍ୟ, ଅତୀତେର ରାଜ୍ଞୀ-ମହାରାଜୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନୁଷେର ରେଖେ ଯାଓଯା କୀର୍ତ୍ତି । ଏସବ କୀର୍ତ୍ତି କାଳେର ଆବର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୱନି ହେଁ ଗେଛେ, କିଛୁ କିଛୁ ମାଟିର ନିଚେ ନାନା କାରଣେ ଚାପା ପଡ଼େ ଗେଛେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵବିଦ ଓ ଐତିହାସିକେରା ଏସବ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେଛେ ।

ପୁରାତତ୍ତ୍ଵବିଦରା ଏସବ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରେ ଆବିଷ୍କାର କରେଛେ । ଖନନ କାଜେର ଫଳେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିର ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଓଯା ଗେଛେ । ଏସବ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂକ୍ଷିତିର ପରିଚୟ ବହନ କରଇଛେ । ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଗୁଲୋ ହଳ- ଶ୍ରାବନ୍ତୀ, ବୈଶାଲୀ, ରାଜଗୁହ,

নালন্দা, তক্ষশিলা, অজন্তা, কপিলবাস্তু, কুশিনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি।

বাংলাদেশের এরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান আছে। যেমন— বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি। এছাড়াও চট্টগ্রামের পঙ্গিত বিহার, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট, ঠেগরপুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বৌদ্ধ নির্দশন হিসেবে আছে সোমপুর মহাবিহার, শালবন মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, হলুদ বিহার, সীতাকোট বিহার প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এসব স্থান ভ্রমণ করলে বৌদ্ধ নির্দশনগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো দেখা যায়। ঐতিহাসিক স্থানের ভৌগোলিক পরিচয় জানা যায়। এতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়। এছাড়াও মনের প্রসারতা বাঢ়ে, ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এসব জ্ঞানগা দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। বই পড়ে লাভ করা জ্ঞানের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখার জ্ঞানের যোগ ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম মতে, তীর্থ ভ্রমণ বা ঐতিহাসিক স্থান দর্শন একটি পুণ্যকর্ম। এতে দুঃখ খণ্ডন, পুণ্য সঞ্চয়, বর্তমান জন্মে সুখ ও পরকালে সুগতি লাভ হয়। এজন্য সকলেরই সাধ্য অনুযায়ী, সময় ও সুযোগ করে তীর্থ দর্শন করা উচিত। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণে যাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক।

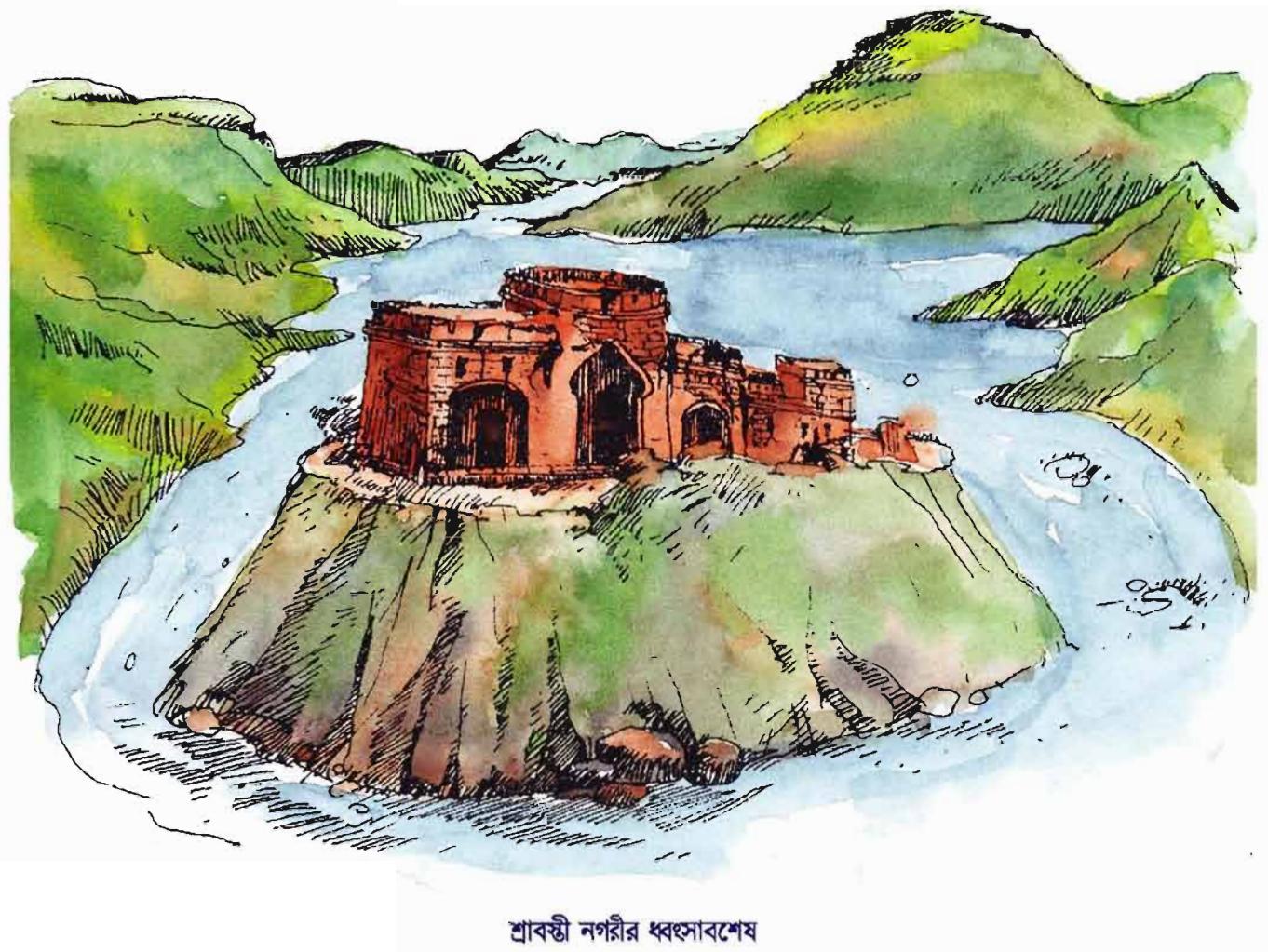
এক কথায় ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া যায় মানুষের শৌর্য, বীর্য ও সমাজ সংস্কৃতির পরিচয়। তাই দেশে ঐতিহ্য সংস্কৃতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা সংরক্ষণে প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া উচিত।

এখন আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা জানতে পারব।

শ্রাবস্তী

শ্রাবস্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোত্তা জেলার অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এ নগরকে অনেকে ‘সবস্থ’ বা ‘সাবস্ত’ বলে। আবার কেউ কেউ ‘সবস্থ’ খবির নামানুসারে এই স্থানের নাম শ্রাবস্তী হয়েছে বলে মনে করেন।

ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দর্শন



শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ

শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত।

বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী ছিল উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জনপদ। এটি ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিঙ্গ-এর রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র। শ্রাবস্তীর সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শ্রাবস্তীতে জ্ঞেতবন, পূর্বারাম এবং রাজকারাম নামে তিনটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। এর মধ্যে জ্ঞেতবন বিহারটি খুবই সুন্দর। শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী ছিলেন সুদৃশ। তিনি বহু স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে রাজকুমার জ্ঞেতবনের কাছ থেকে জ্ঞেতবন উদ্যান ক্রয় করেন। সেখানে তিনি

জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদৃঢ় অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুব প্রিয় গৃহী শিষ্য ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণের স্থান হিসেবে জেতবন উদ্যান পছন্দ করেন। এটি ছিল রাজকুমার জেতের প্রমোদ উদ্যান। সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠী এটি কিনতে চাইলে রাজকুমার বললেন, সোনার মোহরে জমিটি ঢেকে দিতে পারলে তিনি তা বিক্রি করবেন। সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠী সোনার মোহর এনে জায়গাটি ভরে দিলেন। জায়গাটি ক্রয় করেন। তারপর তিনি সেখানে নির্মাণ করেন বিরাট জেতবন বিহার।

ইতিহাস মতে, এতে ৬০টি বড় হলঘর ও ৬০টি ছোট বড় কক্ষ ছিল। বিহারটির তোরণ নির্মাণ করেন রাজকুমার জেত। এই বিহারের ভিতরে ছিল কয়েকটি কুটির। বুদ্ধ জেতবনে ১৯টি বর্ষা যাপন করেন। এখানে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এর পৃতাস্থি রাখা হয়। স্ম্রাট অশোক তা পরে অন্য স্থানে পুনৰ্প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম নামে এক মহাবিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। বিশাখা ছিলেন সাহেত নামক স্থানের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী কন্যা। পরে শ্রাবস্তী নগরীর শ্রেষ্ঠী মিগার বিশাখাকে নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনেন। বিশাখা বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। বিশাখাকে মিগার মাতা বলা হয়। তাই পূর্বারাম বিহারটি মিগারমাতা বিহার নামে পরিচিত। বিহারটি ছিল দ্বিতীয় ভবন বিশিষ্ট। বুদ্ধ পূর্বারামে হয় বর্ষা যাপন করেন। জানা যায়, বিশাখা মহামূল্যবান সোনার হার বিক্রি করে এই পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন।

জেতবনের তৃতীয় বিহার রাজকারাম। কোশালরাজ প্রসেনজিঁৎ এই বিহার নির্মাণ করেন। অগ্রমহিষী মল্লিকা দেবীর অনুরোধে রাজা প্রসেনজিঁৎ এখানে একটি অথিতিশালাও নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল মল্লিকারাম। এতে বুদ্ধের ধর্মদেশনা ও ধর্মালোচনা হতো।

শ্রাবস্তীর কাছেই ছিল অঞ্জন বন। বুদ্ধের শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে এখানে অহর্ত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবর্ণাও বাস করতেন শ্রাবস্তীতে। বর্তমানে মাহেত ও সাহেত নামক স্থানে প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধর্মসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাহেতের জেতবন বিহারের ধর্মসাবশেষ প্রায় চারশত একর এলাকা জুড়ে রয়েছে মূল শ্রাবস্তী নগরীর ধর্মসাবশেষ।

ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦଶନ

ବୈଶାଲୀ

ବୈଶାଲୀ ଭାରତେର ବିହାର ରାଜ୍ୟର ମୋଜାଫଫରପୁର ଜେଲାଯ ଅବସ୍ଥିତ । ବୈଶାଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବେସାର ନାମେ ପରିଚିତ । ରାଜଗୃହ ଓ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଥିକେ ସଡ଼କ ପଥେ ଏଥାନେ ଯାଉୟା ଯାଇ । ବୁଦ୍ଧର ସମୟ ବୈଶାଲୀ ସମ୍ମଦ୍ଧ ନଗରୀ ଛିଲ । ଏଟି ଭାରତେର ସବଚେଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ । ଏଟି ଲିଙ୍ଗବିଦେର ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ । ଆଟଟି ଜାତିର ମିଳିତ ଶକ୍ତିତେ ଏହି ଗଣରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ଛିଲ ।



ବୈଶାଲୀ ନଗରୀର ଚତ୍ୟ ସ୍ତୂପ

ଗଣଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଲିଙ୍ଗବିରା ଛିଲ ସଂଖ୍ୟାଯ ବେଶି । ସେଜନ୍ୟ ଏକେ ଲିଙ୍ଗବି ଗଣରାଜ୍ୟ ବଳା ହୟ । ତ୍ରିପିଟିକେର ମହାବର୍ଗେ ଏର ଉତ୍ସ୍ରୋଧ ଆଛେ । ଏଥାନେ ବହୁ ପ୍ରାସାଦ, କୃଟାଗାର, ପ୍ରମୋଦ ଉଦୟାନ ଓ ପୁରୁର ଛିଲ । ବୁଦ୍ଧ ବୈଶାଲୀତେ ଅନେକବାର ଆସେନ । ତିନି ଏଥାନେ ବର୍ଷାବାସ ଯାପନ କରେନ । ଏଥାନେ ବୁଦ୍ଧ ତାଁର ଶିଷ୍ୟସହ ନର୍ତ୍କି ଆୟପାଳିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ପରେ ତାଁକେ ତ୍ରିଶରଣେ ଦୀକ୍ଷିତ କରେନ । ଆୟପାଳି ବୁଦ୍ଧର ଧର୍ମଦେଶନୋ ଶୁଣେ ଅର୍ହତ୍ ଫଳ ଲାଭ କରେନ । ଚାପାଳ ଚିତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରା କାଳେ ବୁଦ୍ଧ ତାଁର ପରିନିର୍ବାଗେର କଥା ଘୋଷଣା କରେନ । ବୁଦ୍ଧର ପରିନିର୍ବାଗେର ପର ଲିଙ୍ଗବିରା ତାଁର ପୃତାସ୍ଥ ଏନେ ଏଥାନେ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରେନ ।

প্রতিতান্ত্রিকদের মতে, ‘রাজাবিশালকাগড়’ নামক স্থানটি প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ। এটি খননের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন নির্দর্শন পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং বৈশালী পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁরা অনেক স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখতে পান। রাজাবিশালকাগড়ের উত্তরে কোলো নামক স্থানের অন্তিমুরে আছে সিংহমূর্তিসহ একটি স্তম্ভ। এর মধ্যে আছে অশোকের শিলালিপি। হিউয়েন সাং এটি দেখতে পান।

বৈশালী জৈনদের বড় তীর্থস্থান। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

তক্ষশিলা

তক্ষশিলা ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালেই এ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ববর্তীকালেও তক্ষশিলা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশিলা পাকিস্তানের রাওয়াশপিডি নগরের চরিশ কিলোমিটার দূরে সরাইকলা নামক রেলওয়ে জংশনের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি গাম্ভার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনো বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক পদ্ধতি তাঁদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমূদ্রি ও গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় আর্যগণ অতি প্রাচীনকালেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।



তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস স্তূপ

ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দেশন

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী চাণক্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সূত্রের রচয়িতা পাণিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মরক্ষা ও মাতঙ্গ তক্ষশিলার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে গিয়েছিলেন। গুপ্ত রাজাদের শাসনামলে চীন দেশ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।

এখানে নানা ললিত কলা, ধর্মদর্শন, চিকিৎসবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। মহাবর্গ গ্রন্থেও এর বিপুল খ্যাতির কথা বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাকে বৌদ্ধগণ ‘তক্ষসির’ বা ‘তাকসিলা’ নামে অভিহিত করেছেন। জাতক অনুসারে জানা যায় বুদ্ধ কোনো এক জন্মে এ স্থানে শির দান করে আত্মাত্সর্গ করেছিলেন। কুস্তিকার জাতকে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিলা ‘নগ্নগজি’ নামক এক রাজার রাজধানীও ছিল।

সম্রাট বিন্দুসার কুমার অশোককে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দীপবৎস থেকে জানা যায়, দীপৎকর নামে এক বৌদ্ধ রাজা ও তাঁর ১২ জন উত্তরসুরি তক্ষশিলা শাসন করেন। কুষাণরাজ কণিষ্ঠেকর সময়ে তক্ষশিলা থেকে রাজধানী পুরুষপুরে স্থানান্তরিত করলে তক্ষশিলার মর্যাদা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। তৎকালে রাজপুত্র, ধনী ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলাকেই প্রাধান্য দিতেন। রাজবৈদ্য জীবক তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

কথিত আছে, তিনি চৌদ্দ বছরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বছরে সমাপ্ত করেছিলেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদান করেছিলেন। তাঁর জাতি ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে এ নগর আক্রমণ করে ধ্বংস করেন।

মহাস্থানগড়

বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম পুন্ড্রবর্ধন। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এক সময় পুন্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের শাসন কেন্দ্র ছিল। মহাস্থানগড়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজাদের রাজত্বকালে এটি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য ও বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ স্থানে খনন কার্যের ফলে বিভিন্ন যুগের বহু ধর্মসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধযুগের বহু নির্দর্শন এ স্থানে বিদ্যমান।



ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন পুঁজুবর্ধনই মহাস্থানগড়। এটি প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ নগরী ছিল।

মহাস্থানগড়

বিখ্যাত চীনা পরিত্রাজক হিউয়েন সাঙ এখানে আসেন। তিনি এখানে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য দেখেছিলেন। নগর প্রান্তে বৃক্ষের দেহাবশেষ সংরক্ষিত একটি স্তুপ দেখতে পান। সম্রাট অশোক স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন।

১৮০৮ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ বুকানন হেমিল্টন স্থানটির প্রথম বর্ণনা দেন। চৈনিক পরিত্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃক্ষান্ত মতে ১৮৭১ সালে স্যার কানিংহাম স্থানটি পরিদর্শন করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নরপতির ধাপ নামক জঙ্গল খনন করতে গিয়ে ভাসু বিহারের আবিষ্কার করেন। এটি একটি বিরাট বিহার।

ভাসু বিহারের ধর্মসাবশেষ থেকে প্রাচীন মুদ্রা, নানা দ্রব্য, ধ্যানী বৃক্ষ, বোধিসত্ত্ব অবশেকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, ধর্মচক্র ও বৃক্ষ পূজারিণীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বহির্ভাগে গোকিন্দ ভিটা, মৎকনির কূন, বৈরাগী ভিটা প্রভৃতি নির্দর্শন আছে।

ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দেশন

মহাস্থানের খনন কাজ অনেক দিন আগে শুরু হয়েছিল। এখনও শেষ হয়নি। অর্ধখনন অবস্থায় পড়ে আছে। প্রাচীন নির্দেশন সমৃদ্ধ মহাস্থানগড় অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার মাটির নিচে পড়ে আছে বহু বৌদ্ধ নির্দেশন। সঠিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চালান হলে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নওগাঁ জেলার একটি বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালবংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। রাজা ধর্মপাল তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। এ বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সোমপুর (বা ওমপুর) গ্রামটি এখনও সেই প্রাচীন নামের স্মৃতি বহন করছে।

সে সময় এত বড় বিহার হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে আর ছিল না। ভারতের উত্তরে নর্মদা থেকে উজ্জয়নী পর্যন্ত রাজা ধর্মপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যের মধ্যেও এটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার। তাঁর স্ত্রী রন্নাদেবী ‘মূর্তিমতি কীর্তি’ বলে বর্ণিত হয়েছেন। কারণ তিনিও অনেক বিহার ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সে বিহার ও মন্দির সোমপুর বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উদারতা ও বৌদ্ধধর্মে পৃষ্ঠপোষকতাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মপাল সোমপুর বিহারকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেখে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইটের তৈরি উচু ও পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল প্রতিষ্ঠানটি। সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরে ১৭৭টি কক্ষ ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতো এবং ধর্মচর্চা ও ধ্যান সমাধি করতো।



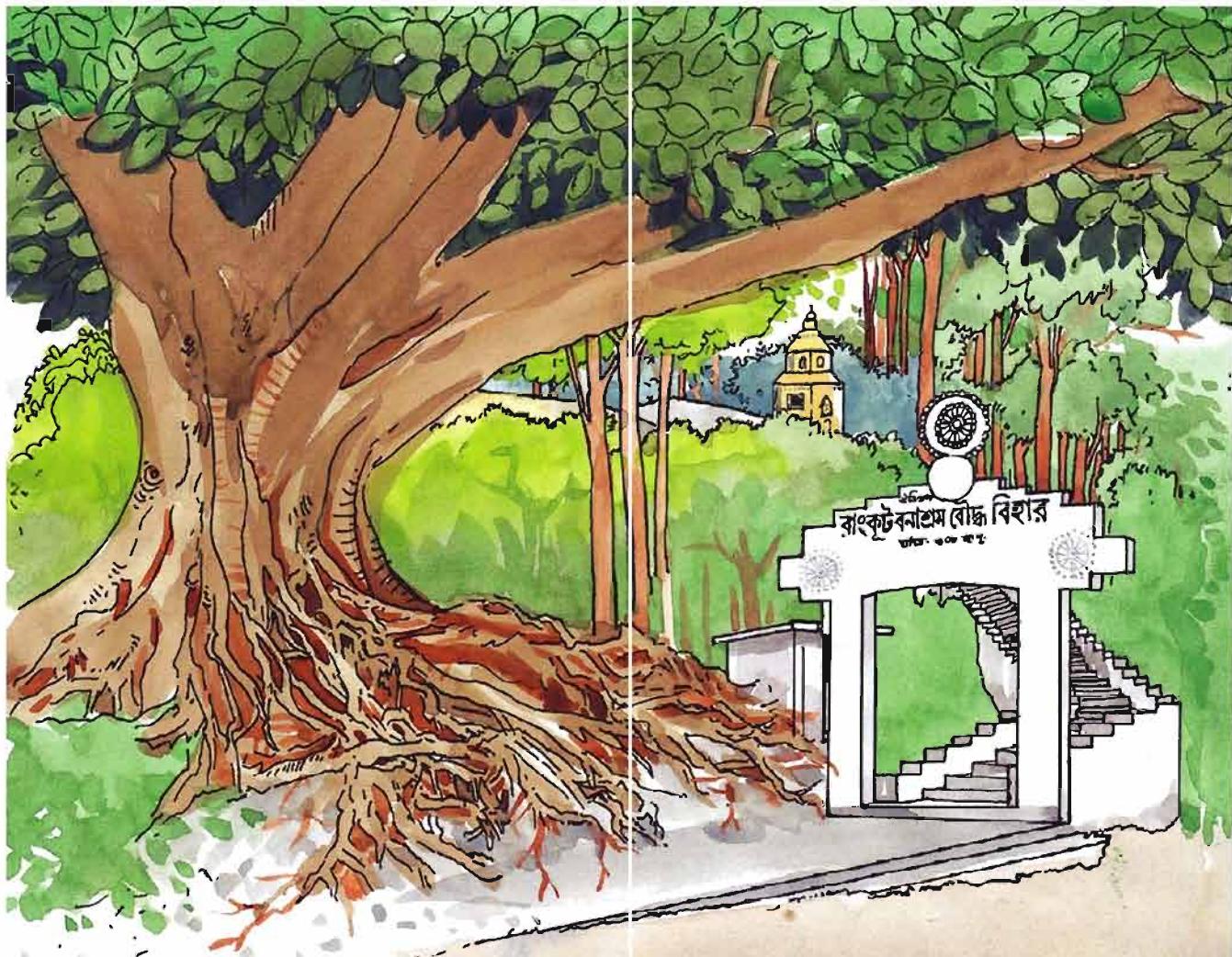
সোমপুর মহাবিহার

বিশাল বিহার সংলগ্ন ছিল জলাধার ও জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা। সোমপুর বিহারের ভিত্তি ও নিচের চতুরঙ্গের কারুকাজ ছিল অপূর্ব। পোড়ামাটির তৈরি ফলকের বিভিন্ন চিত্র সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

মহাপন্ডিত ভিক্ষু বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করতেন। তাঁদের রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এ বিহারে বসে ‘ভাব বিকেকের মধ্যমকর রত্নাদ্বীপ’ গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তিব্বতে ধর্ম প্রচার করে অমর হয়ে আছেন। কল্যাণশ্রী মিত্র ও বিপুলশ্রী মিত্র এ বিহারে থাকতেন। পাল বংশের পতনের পর ধীরে ধীরে বিহারের উন্নয়ন সমৃদ্ধি লুপ্ত হতে থাকে। এক সময় অযত্ত্ব অবহেলায় প্রাকৃতিক কারণে এটি মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি জাতিসংঘ সোমপুর বিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রামকেট

কঙ্গবাজারের নিকটবর্তী রামভূমি রামুর রামকেট বিহার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য। এক সময় রামু বৌদ্ধ সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রামুর লামার পাড়া কেয়াং, সীমা বিহার অত্যন্ত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।



রামুর রামকেট বিহার

রামকেট ছোট বড় অনেকগুলো পাহাড় বৈষ্ণব ইটের স্তুপ, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক এখনো অনুচ্ছ টিলার উপর অবস্থিত। পাশে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রামকেট জগতজ্যোতি শিশু সদন।



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

বৌদ্ধধর্ম ও নেতৃত্বিক শিক্ষা

১৯৩০ সালে জগৎকন্দ্র মহাস্থবির শ্রীলংকায় উদ্ধারকৃত একটি শিলালিপিতে রামকোট বিহারের কথা জানেন। এতে প্রাপ্ত তথ্য মতে অনুসন্ধান ও খনন কার্য চালিয়ে এ সুবহৃৎ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। এতে বেলে পাথরের নির্মিত ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও হস্তপদাদি তগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ ছিলেন চকরিয়া হাররাং - এর চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির। তিনি ছিলেন চেন্দি রাজের পুত্র। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার অভিযানে রামুর পল্লীগ্রামে এসে উপনীত হন। রামুতে তিনি সাতটি ধর্মচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস মতে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে ধর্মপালের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম স্বল্প সময়ের জন্য পাল সম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা। অর্থাৎ বৃহত্তম চট্টগ্রামের রামু। রামুকে রম্যভূমি বা রম্যস্থান বলা হয়। রামুর প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম শাসনামলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে, রামকোট বৌদ্ধ বিহার ও সধাতুক বড় বুদ্ধমূর্তি সম্মাট অশোকের নির্মিত ৮৪ হাজার চৈত্যের মধ্যে একটি। ঐতিহাসিক রামকোটে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। এই প্রত্নস্থল ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দর্শনে দ্বিদশী বিদেশী অনেক পর্যটক ও ইতিহাস গবেষক আসেন। এটি বর্তমানে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও পুণ্যতীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

তোমরা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করবে। বাংলাদেশের সর্বত্র মাটির নিচে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, ওয়ারি বটেশ্বর, চুকুশালা, রামকোট প্রভৃতি স্থানগুলো পুরাতন স্মৃতি হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে তীর্থে পরিগত হয়েছে। পর্যটকদের কাছেও অজানাকে জানার প্রেরণা দিচ্ছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর। আমাদের হারানো গৌরবময় অতীতকে জানতে হলে এসব ঐতিহাসিক স্থান দর্শন প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উভয়ের টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধন করেছিলেন?

- | | |
|--------------|--------------------|
| ক. পালরাজারা | খ. ক্ষত্রিয়রাজারা |
| গ. সেনরাজারা | ঘ. বজ্জিরাজারা |

২. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করার উদ্দেশ্য কী?

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ক. নিজের ইচ্ছা পূরণ | খ. মনের প্রসারতা বৃদ্ধি |
| গ. বুদ্ধ জ্ঞান লাভ | ঘ. মার্গফল লাভ |

৩. মহাউপাসিকা বিশাখা কোন বিহার নির্মাণ করেন?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. পূর্বারাম | খ. জেতবন |
| গ. সোমপুর | ঘ. বুদ্ধগয়া |

৪. সম্রাট বিদ্যুসার কাকে তক্ষশিলা বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

- | | |
|--------------|----------------------|
| ক. ধর্মপাল | খ. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান |
| গ. অজাতশত্রু | ঘ. কুমার অশোক |

৫. বুদ্ধ কোথায় পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন?

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. শ্রাবণ্তী | খ. তক্ষশিলা |
| গ. চাপাল চৈত্য | ঘ. কুশীনগর |

৬. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. বগুড়া | খ. রাজশাহী |
| গ. রংপুর | ঘ. দিনাজপুর |

৭. পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটির নাম কী?

- | | |
|-----------|---------------|
| ক. বেণুবন | খ. শালবন |
| গ. সোমপুর | ঘ. ভাসু বিহার |

৮. রামকেট কে আবিষ্কার করেন?

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ক. জগৎস্ত্র মহাস্থবির | খ. সারমেধ মহাথের |
| গ. চন্দ্রজ্যোতি মহাথের | ঘ. সত্যপ্রিয় মহাথের |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে |
২. ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের এক পরম |
৩. ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সৃষ্টি হয়।
৪. শ্রাবণ্তীর বর্তমান নাম |
৫. জীবক বছর আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন।
৬. সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন।
৭. রামকোটে প্রতি বছর মেলা বসে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো ২. বুদ্ধের সময়ে বৈশালী ৩. বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদৃঢ় ৪. এক সময় পুদ্রবর্ধন ৫. পাল বংশের রাজারা ৬. সোমপুর মহাবিহারে 	<ol style="list-style-type: none"> ১. বৌদ্ধ ছিলেন। ২. উত্তরবঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল। ৩. একটি জাতির মূল শেকড়। ৪. ১৭৭ টি কক্ষ ছিল। ৫. সমৃদ্ধ নগরী ছিল। ৬. অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন। ৭. গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম সেখ?
২. তক্ষশিলায় কারা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন উল্লেখ কর।
৩. শ্রাবণ্তীর জ্ঞেতবন বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম কী? স্থানটি কেমন ছিল?
৫. সোমপুর বিহারে কোন কোন পশ্চিত অবস্থান করেছিলেন?
৬. ভাসু বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. রামুর প্রাচীন নাম কী ছিল?

ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দশন

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উভয় দাও :

১. বৌদ্ধ ঐতিহ্য কী? ঐতিহাসিক স্থান হলো কেন দর্শন করবে?
২. ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৩. তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ দাও।
৪. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বৈশালীর বর্ণনা দাও।
৫. সোমপুর মহাবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬. মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে রামকোট বিহারের বর্ণনা দাও।



দশম অধ্যায়

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্য দ্বারা সংসার জীবনে সুখ আসে। এজন্য বৌদ্ধরা শ্রদ্ধার সাথে বিভিন্ন পুণ্য তিথি পালন করে।

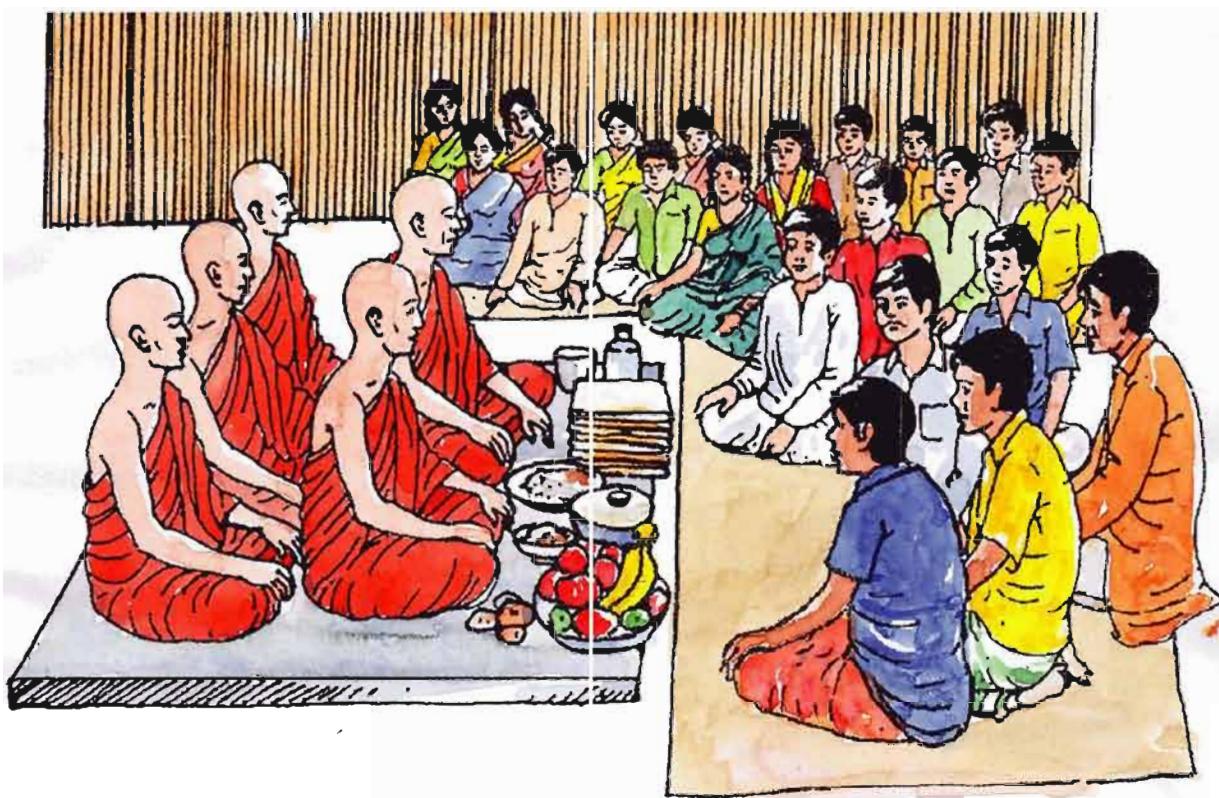
ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে তোমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এখন তোমরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে। উৎসবের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত। যেমন— সংহিতান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রবজ্ঞা, উপসম্পদা, প্রবারণা এবং কঠিন চীবর দান প্রভৃতি। পরিত্রাণ ও নবরত্ন সূত্র পাঠ, বহুচক্র মেলাও ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের অন্তর্গত। এছাড়া পরিবাস বা ওয়াইক, জান্ম-জয়ন্তী, অন্ত্যুষ্টিক্রিয়া, আরো অনেক রকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়।

বৌদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। এজন্য বৌদ্ধরা সুখ লাভের আশায় বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব শুভ কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয়। মনে পুণ্য সঞ্চিত হয়। পুণ্য প্রভাবে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

প্রতিটি বিহারে পূর্ণিমার দিন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পূর্ণিমা ছাড়াও অন্যান্য পার্বণ দিনেও বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পাঁরিবারিকভাবে সংহিতান, অষ্টপরিষ্কার দান প্রবজ্ঞাসহ আরো নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে বিহারে কিংবা গৃহে অনেক লোকের সমাগম হয়। এসব উৎসাব অনুষ্ঠানে যোগদান করলে একজন অন্য একজনের সাথে সাক্ষাত হয়। সাক্ষাতে কৃশল বিনিময় হয়। ভাব বিনিময় হয়। এতে জ্ঞাতি মিলন হয়। স্বজন পরিজনসহ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব জগ্নত হয়। সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেদের মনের মলিনতা দূর হয়। মন উদার হয়। সামাজিক ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে প্রত্যেককে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করা কর্তব্য।

সংবিধান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সংবিধান অন্যতম। বৌদ্ধরা যে কোন শুভ ও মঙ্গল কর্মে সংবিধান করে থাকে। তগবান বৃক্ষ সংবিধকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন। কারণ তাঁরা শীলবান ও খাজু প্রতিপন্ন। তাই সংবিধকে দান করলে মহাফল সাভ হয়। কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও সংবিধান করা হয়। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান, নব জাতকের অনুপ্রাপনের সময়, প্রবৃজ্যা অনুষ্ঠানে সংবিধান করা হয়। এ দান বছরের যে-কোন সময় করা যায়। সংবিধান উপলক্ষে কমপক্ষে ৪ জন ভিক্ষুকে নিমিত্তণ বা ফাঁক করতে হয়।



সংবিধানে অংশগ্রহণকারী দায়ক-দায়িকা ও ভিক্ষুসংঘ।

সংবিধানে নিমিত্তিত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই পঞ্চশীল প্রদান করেন। সংবিধান উৎসবের মন্ত্র হলো “ইমৎ ভিক্খৎ সপরিকথারং ভিক্খু সংবিধস্ম দেমা পুজেমা”— মন্ত্র বলে সংবিধান উৎসর্গ করেন। সংবিধান অনুষ্ঠানে জ্ঞানী পক্ষিত ভিক্ষুরা সংবিধানের তাংপর্য নিয়ে ধর্মদেশনা করেন। সংবিধানের পুণ্য ফল ব্যাখ্যা করেন।

যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন উৎপকরণের প্রয়োজন হয়। সংহিতারের জন্যও দাতারা ভিক্ষুদের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন দানের উপকরণ দিয়ে থাকে। সংহিতারে অনেকে সংহিতারের সময় ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় অষ্টপরিষকারও দান করে থাকেন।

প্রবারণা

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্ণিমা তিথিগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসবের মধ্যে আশ্বিনী পূর্ণিমার তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। এ দিবসে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষবাসের পরিসমাপ্তি হয়। তাই এ পুণ্য তিথিতে ভিক্ষুরা বিনয় কর্মের মাধ্যমে প্রবারণা করে থাকেন।

‘প্রবারণা’ শব্দের অর্থ হল পাপকে বারণ করা। অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ তিনি মাস বর্ষাবাস উদ্যাপন করা হয়। এ তিনি মাসের মধ্যে একজন ভিক্ষু যে কোন অপরাধ করতে পারেন। তাই প্রবারণা পূর্ণিমায় করজোড়ে বসে অপরাধ মার্জনাপূর্বক বিনয়কর্ম সম্পাদন করেন। সে মন্ত্রটি হল: আমি দেখেছি, শুনেছি এবং সন্দেহ করছি, এমন কোন আপস্ত্রিজনক কাঙ্গ করলে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

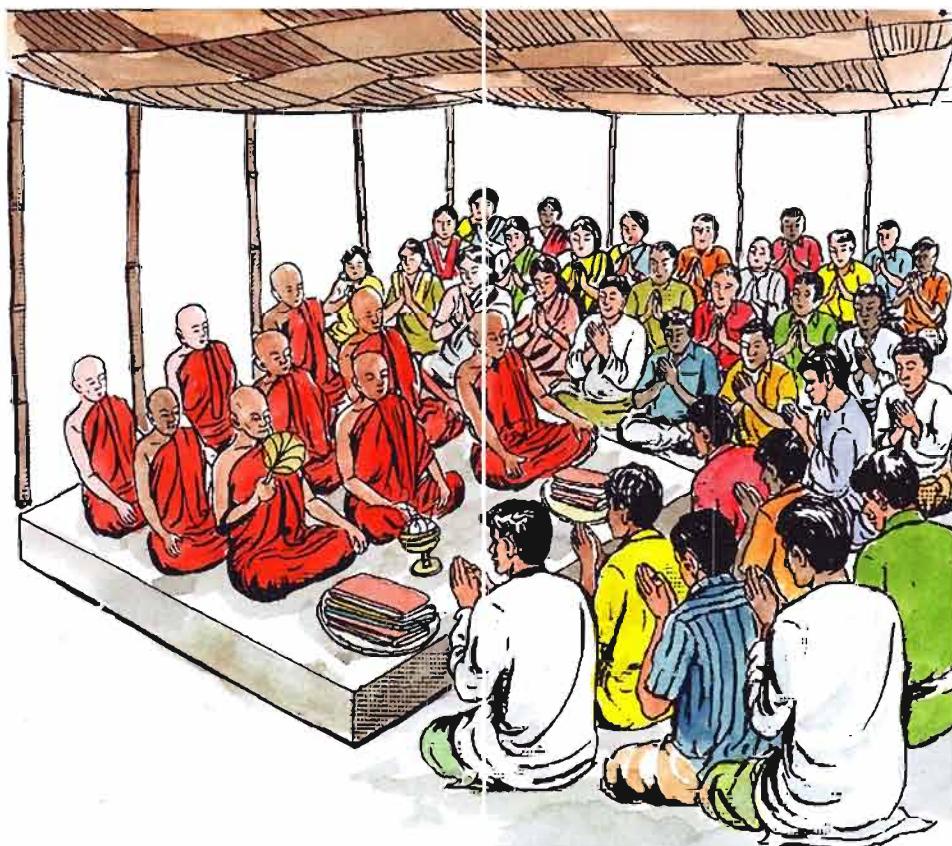
গৃহী বৌদ্ধদেরকেও প্রবারণার তাৎপর্য উৎপলদ্ধি করা উচিত। নিজ মন শুন্ধির জন্য প্রবারণার তাৎপর্য অনুধাবন করা কর্তব্য।

প্রবারণার দিন বিহারে ও গৃহে অনেক আনন্দ উৎসব চলে। ঘরে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। বিহারকে নানা রংয়ে সাজানো হয়। এমন কী গ্রামের রাস্তাগুলোকেও নানা রঙিন কাগজ ও ধর্মীয় পতাকায় সাজানো হয়। সেদিন সকাল থেকে গ্রাম ও বিহার যেন উৎসব মুখর হয়। ছোট বড় সেদিন বিহারে যায়। বিহারে সকালে সংহিতান হয়। বৃদ্ধ পূজা করা হয়। গৃহীরা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। উপাসক-উপাসিকারা অষ্টশীল নেন। বিকালে প্রবারণার তাৎপর্যের উপর আলোচনা সভা হয়। এতে ভিক্ষুসংসহ অনেক পঞ্চিত দায়ক-দায়িকারা প্রবারণার নানা দিক তুলে ধরেন।

সন্ধিয়ায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। এরপর ফানুস উড়য়ন করা হয়। এতে ছোট বড়, নবীন প্রবীণ সকলে আনন্দে মেঠে উঠে। রাতে ধর্মীয় কীর্তন বা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কঠিন চীবর দান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কঠিন চীবর দান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান এ কঠিন চীবর দানোৎসব জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে বৃপ্ত লাভ করেছে। এ দান উপলক্ষে বৌদ্ধরা জাতীয় ও ধর্মীয় সম্মেলনও করে থাকে। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান বছরের যে কোন সময়ে করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর বছরে একটি বিহারে একবার মাত্র করা যায়। এ দানোৎসব করতে হলে অনেক ধর্মীয় বিধান মানতে হয়।



বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবে অংশগ্রহণকারী, ভিক্ষুসংঘ এবং সকল সত্ত্বের নর-নারী ও দায়ক-দায়িকাঙ্গদ ভিক্ষুদেরকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন বর্ষাবাস গ্রহণ করতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ষাবৃত্ত গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। এ তিন মাসকে বর্ষাবাস বা ওয়া মাস বলা হয়। বর্ষাবাস করার জন্য ভিক্ষুদের বিভিন্ন নিয়ম আছে।

ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যে কোন একটি চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দান করা যায়। কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে বিহারের বর্ষাবাস গ্রহণকারী ভিক্ষু ব্যতিত কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষু ফাঁ বা



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নিম্নলিখিত করতে হয়। বিহারের দায়ক-দায়িকারা চীবর ও দানীর সামগ্রীসহ ভিক্ষুসংঘের সামনে উপস্থিত হন। দায়িক-দায়িকাগণ বয়োজ্যষ্ঠ মহাথেরোর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। এরপর “ইমৎ কঠিন চীবরং ভিক্খুসংঘস্স দেমা পুজেমা কঠিনাভরিতুং” বলে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। দাতাগণ মুখে মুখে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে চীবরটি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ভিক্ষুগণ এ দানকৃত চীবর সীমায় নিয়ে কর্মবাচ্চা পাঠ করে বর্ষাবাস সমাপনকারী ভিক্ষুকে প্রদান করেন।

এ কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে বিহারকে পরিমার্জন কার হয়। বর্ণাচ্যতাবে সাজানো হয়। সকালে সংঘদান করা হয়। ধর্মাসভায় পণ্ডিত ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর দানের তাৎপর্য দেশনা করেন। ভগবান বুদ্ধও কঠিন চীবর দানের মহাফল সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন; ভিক্ষুগণ তাও দেশনা করেন। সভায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এতে দেশের বরেণ্য পণ্ডিত ভিক্ষু ও গৃহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রাঞ্জ ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক যাত্রা, নাটক, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শিশু-কিশোর, যুব-বৃন্দ সকলে আনন্দে মেতে থাকে। সারাদিন আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

লোক সমাজে বাস করতে হলে নিজেদের মধ্যে সৌভাগ্য ভাব গড়ে তুলতে হয়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে সমাজের শান্তি বিরাজ করে। এজন্য পরম্পরারের সাথে মৈত্রী বন্ধন রচনা করতে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মিলনের জন্য একমাত্র সেতুবন্ধন। এর দ্বারা নিজের ও সমাজের বহু মঞ্চল সাধিত হয়।

প্রবৃজ্যা

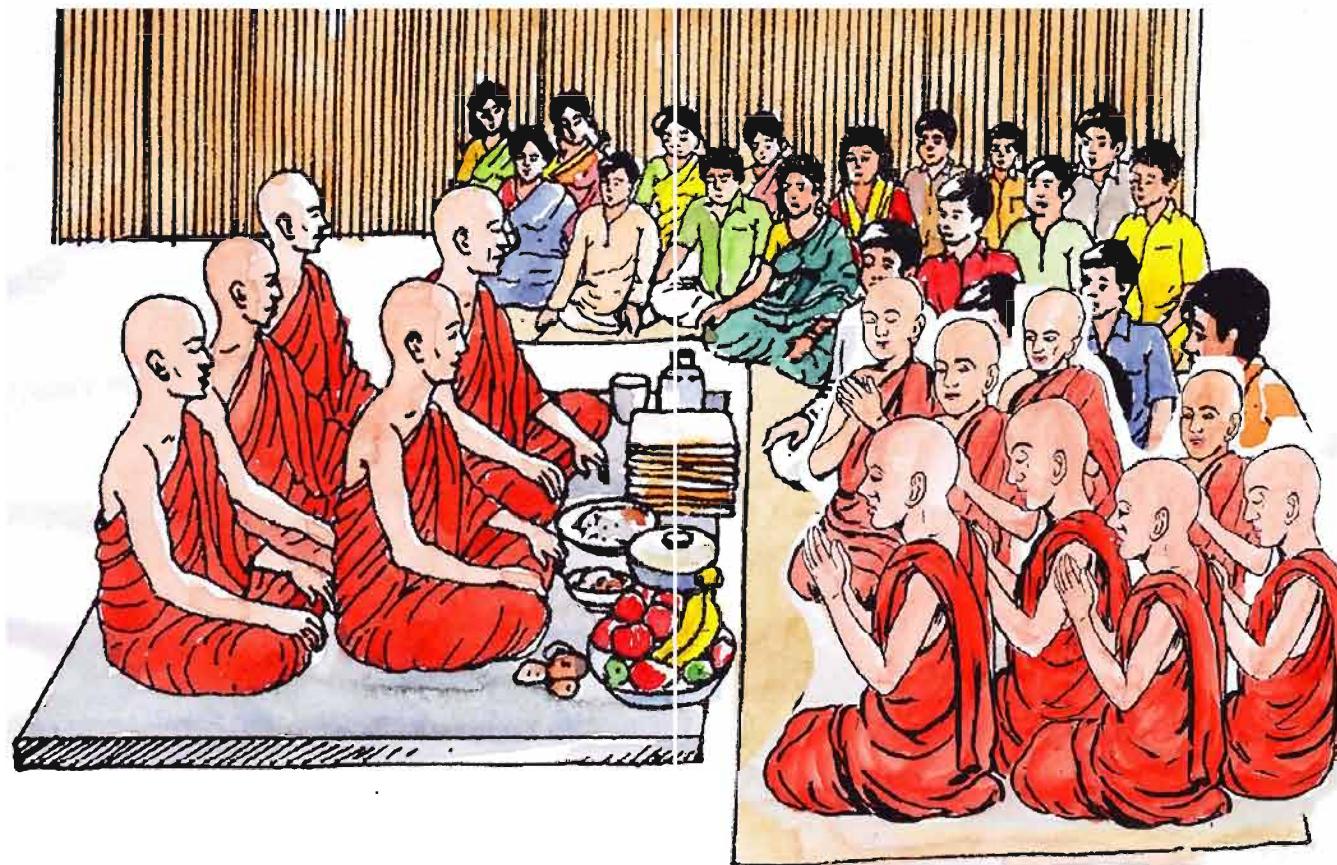
বুদ্ধের অনুশাসন মতে গৃহীদেরকে জীবনে একবার হলেও প্রবৃজ্যাধর্ম গ্রহণ করতে হয়। যারা প্রবৃজিত হন, তাঁদেরকে কমপক্ষে ৭ বছরের বয়সের হতে হয়। রাতুলও ৭ বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেন।

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হলে মাতা-পিতার অনুমতি প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা প্রবৃজ্যা গ্রহণের নিয়মগুলো জানবে।

ধ্রীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে প্রথমে মস্তক মুক্তন করতে হয়। ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র, সূচ-সূতা, কটিবস্ত্রনী, জল ছাকুনী, খুর প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে বিহারে তিক্ষুর নিকট গমন করতে হয়। শ্রামণের ব্যবহারের জন্য পাটি, বালিশ, মশারী, চাদর, সেন্ডেল তোয়ালে প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী ও পূজার নানা উপকরণ দান করা যায়।

সে সময় বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে এবং সাধুবাদ ধ্বনি দিয়ে দায়ক-দায়িকারা বিহারে যান। যিনি শ্রমণ হবেন, তাঁকে প্রথমে বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপ বাতি জ্বালিয়ে ত্রিভুবন কব্দনা করতে হয়। পরে বড় জনদেরকে নমস্কার করে, গুরু ভট্টের সামনে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসতে হয়। পরে গুরুর মুখে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণ হওয়ার পর উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাগণ নব দীক্ষিত শ্রমণকে কব্দনা করে থাকেন। নব দীক্ষিত শ্রমণকে তখন হাতে দশশীল পালন করতে হয়। এর সাথে ৭৫ প্রকার সেবিয়া ধর্মও পালন করতে হয়।



ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ

পালি ‘পরবজ্জ্বা’ হতে বাংলায় প্রবৃজ্যা এসেছে। ‘প্রবৃজ্যা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো পাপকর্ম বর্জন করা। যাঁরা প্রবৃজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন, তাঁর কায়-মনো-বাক্যে কোন রকম পাপ করতে পারে না।

তোমার প্রবৃজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে কিভাবে শ্রমণ হয় আগে জেনেছ। এখন জানবে উপসম্পদা কী? শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পরিপূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলো উপসম্পদা লাভ করা যায়। প্রবৃজিত জীবনের উচ্চতম পদ হলো উপসম্পদা। উপসম্পদা হলো ভিক্ষুত্বে উপনীত হওয়া। উপসম্পদা প্রাপ্ত শ্রমণ ‘ভিক্ষু’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। ২০ বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না। ভিক্ষু হওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ প্রয়োজন হয়। ভিক্ষুগণ ২২৭ শীল গ্রহণ ও পালন করেন।

প্রবৃজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য কী তোমরা জানতে পারবে।

প্রবৃজ্যা বা শ্রমণ	উপসম্পদা বা ভিক্ষু
<ol style="list-style-type: none"> ১. সাত বছর পূর্ণ না হলে কেউ শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। ২. সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান ও শুদ্ধ্যা থাকলেই শ্রমণ হওয়া যায়। ৩. যে কোন একজন বয়স্ক স্থবির (ভন্টে) শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিতে পারেন। ৪. যে কোন স্থানে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করা যায়। ৫. শ্রমণদের দশশীলসহ ৭৫ প্রকার সেখিয়া ধর্ম পালন করতে হয়। ৬. শ্রমণদের প্রতিদিন দশশীল গ্রহণ করা কর্তব্য। ৭. শ্রমণেরা নিজ হাতে যে কোন খাবার গ্রহণ করতে পারে। 	<ol style="list-style-type: none"> ১. বিশ বছর পূর্ণ না হলে কেউ উপসম্পদা লাভ বা ভিক্ষু হতে পারে না। ২. ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট কত গুলো শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সেগুলো না জানলে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না। ৩. কমপক্ষে দশজন ভিক্ষু উপস্থিত না হলে ভিক্ষু হতে পারে না। ৪. ভিক্ষু সীমাবদ্ধ অথবা উদক সীমা ব্যতিত অন্য কোন স্থানে ভিক্ষু হওয়া যায় না। ৫. ভিক্ষুদেরকে ২২৭ টি শীল পালন করতে হয়। ৬. ভিক্ষুদের প্রতিদিন আপত্তি দেশনা করা কর্তব্য। ৭. ভিক্ষুদের হাতে খাবার উঠিয়ে না দিলে গ্রহণ করতে পারে না।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) টিক দাও :

১. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণ অর্জন হয়া ?

ক. ধর্মীয় উৎসব

খ. সামাজিক উৎসব

গ. পূজার উৎসব

ঘ. বিবাহ উৎসব

২. কোন প্রভাবে মানুষ দৃঢ়খ মুক্তি লাভ করতে পারে ?

ক. অর্থ প্রভাবে

খ. মানুষের প্রভাবে

গ. পুণ্যের প্রভাবে

ঘ. কর্মের প্রভাবে

৩. কিসের বলে তব সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় !!

ক. জন বলে

খ. শুদ্ধ্বার বলে

গ. মনো বলে

ঘ. পূজার বলে

৪. সংবাদান উপলক্ষে কমপক্ষে কয়জন ভিক্ষুকে নিমজ্ঞণ করতে হয় ?

ক. ৪ জন

খ. ৫ জন

গ. ৬ জন

ঘ. ৭ জন

৫. কাকে দশশীল পালন করতে হয় ?

ক. শ্রমণকে

খ. ভিক্ষুকে

গ. উপাসক-উপাসিকাকে

ঘ. বাল্ক-বালিকাকে

৬. কোন দান বছরে একই বিহারে একবারের বেশি অনুষ্ঠিত হতে পারে না ?

ক. কঠিন চীবর দান

খ. অষ্ট পরিষ্কার দান

গ. সংবাদান

ঘ. পিণ্ডান

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধরা প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।

২. বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম।

৩. ভিক্ষুদেরকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার গ্রহণ করতে হয়।

৪. শ্রমণদের জন্য দশ শীল এবং সেখিয়া ধর্ম রয়েছে

৫. গৃহী বৌদ্ধরাও তাৎপর্য উপলক্ষ্য করা উচিত।

৬. বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

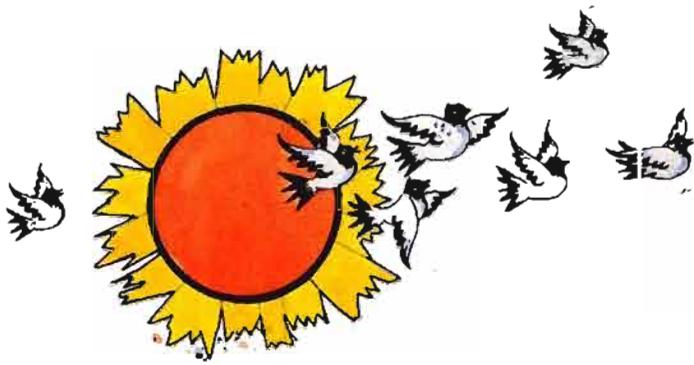
বাম	ডান
১. বৌদ্ধরা বুদ্ধের	১. মহাফল লাভ হয়।
২. বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব	২. কঠিন চীবর দানোৎসব হতে পারে না।
৩. সংঘদান করলে	৩. প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।
৪. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি	৪. অনুষ্ঠানের দ্বারা মনে শৃঙ্খা উৎপন্ন হয়।
৫. ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যে কোন একটি	৫. চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব করা যায়।
৬. ছেলে-মেয়েরা সারাদিন	৬. সীমাঘর প্রয়োজন হয়।
	৭. আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. কী কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয় ?
২. ভগবান বুদ্ধ কাকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন ?
৩. কোন পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুরা আপত্তি দেশনা করেন ?
৪. ভিক্ষুদের কী মোচনের জন্য ক্ষমা চাও়য়া উচিত ?
৫. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি কোন উৎসব হতে পারে না ?
৬. ‘পৰবজা’ শব্দের অর্থ কী ?
৭. শ্রমণেরা কয়টি সেখিয়া ধর্ম পালন করে ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধরা কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে তার নাম উল্লেখ কর।
২. ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের সূফল কী বর্ণনা কর।
৩. সংঘদান অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণনা কর।
৪. কঠিন চীবর দানের মনোজ্ঞ বর্ণনা দাও।
৫. ‘প্ৰবজ্যা’ শব্দের অর্থ কী ? কীভাবে প্ৰবজ্যা গ্ৰহণ কৰতে হয় ?
৬. শ্রমণ ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।



একাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম

মানুষ সমাজবন্ধ জীব। একই সমাজে নানা জাতি গোষ্ঠী ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে পরস্পরের সহযোগী হয়ে বসবাস করে। সবাইকে নিয়েই সমাজ। মানবসমাজে থাকবে সামাজিক ঐক্য সংহতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বক্ষন। একটি বনে বা বাগানে যেমন— নানা জাতের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানব সমাজও সে রকম। তাই একই সমাজে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ না থাকলে সে সমাজ সুস্থির মনে হয় না।

প্রত্যেক পরিবারে যেমন নিয়ম শৃঙ্খলা থাবে, তেমনি সমাজেও নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে। নিয়ম কানুন ছাড়া মানুষ একত্রে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। যার যার খুশি মত চললে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য প্রত্যেক ধর্মের উপদেশ হলো— ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং এর মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উপকার সাধন করা।

সমাজ জীবনে দুই রকম নীতি প্রচলিত থাকে, একটি সাধারণ নীতি; অন্যটি ধর্মীয় নীতি। সাধারণ নীতিমালার মধ্যে থাকে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা, দায়িত্ব কর্তব্য ও সামাজিক রীতিনীতি। আর ধর্মীয় নীতির মধ্যে থাকে ধর্মীয় বিধি, আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণের নিয়ম-নীতি প্রভৃতি।

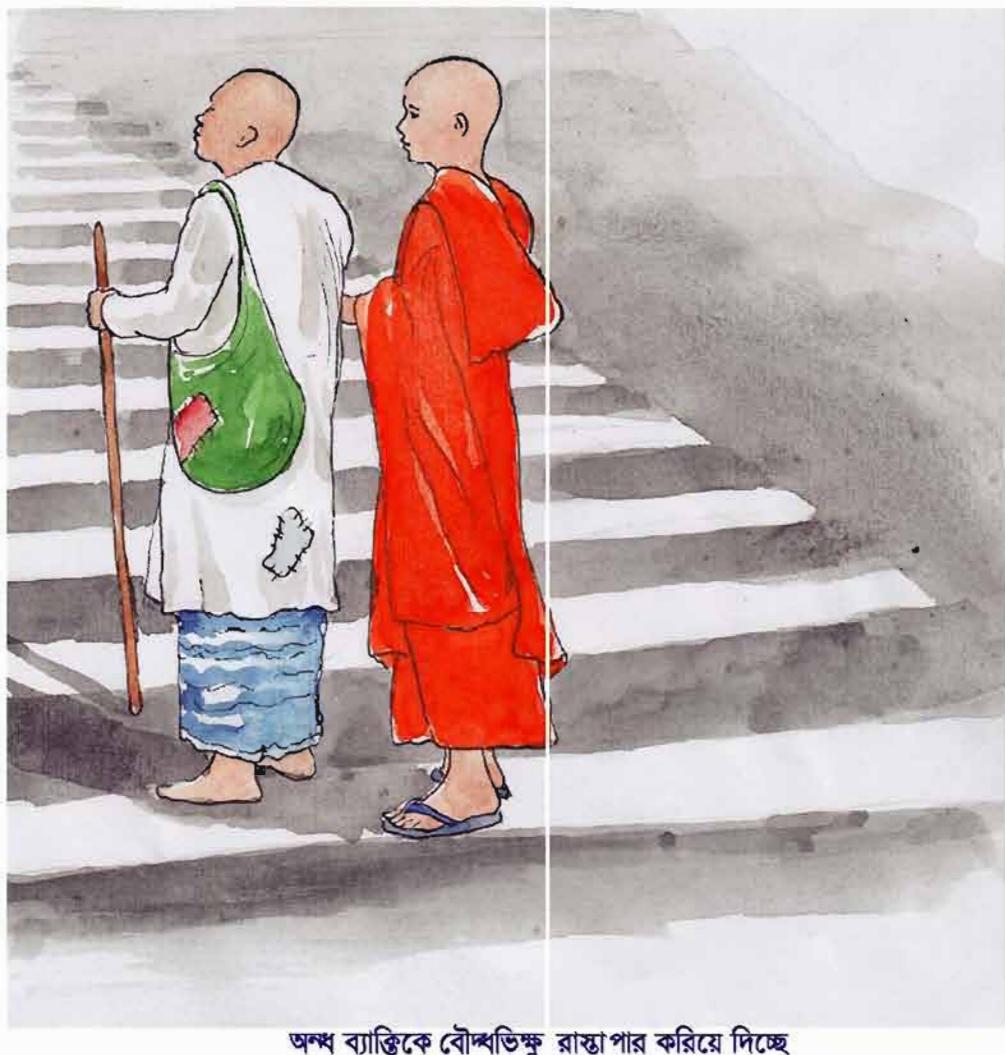
দায়িত্ব কর্তব্য মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। উন্নতির জন্য কোন দেবতা কিংবা অঙ্গোকিক শক্তি কাজ করে না। নিজের আপন শক্তিই যথেষ্ট। কারণ মানুষের আছে অনন্ত কর্মশক্তি। সেই শক্তি দিয়ে মানুষ তার আপন মনুষ্যত্বকে আলোকিত করতে পারে। মানুষ তার আত্মশক্তি দিয়েই বিশ্বের সব কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এজন্যই বৌদ্ধধর্মে মানুষের কর্মকে প্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

অন্যদিকে জননী ও জন্মভূমির সাথে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্ম মতে, দেশের গৌরবকে সমুদ্রত রাখা একজন সুনাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

একটি শত্রুতা আরেকটি শত্রুতার জন্ম দেয়। একটি আঘাত-আরেকটি প্রতিহিংসা তৈরি করে। অতএব এই সত্যনীতিকে ধারণ করে আমাদের মনের সকল প্রকার হিংসা,

প্রতিহিংসা, অশুভ ভাবনা ও মন্দ চিন্তা দূর করতে হবে। সর্বদা সৎ ও কুশল কর্মে ব্রতী হতে হবে। সত্য ও ন্যায়পথে চলতে হবে। অপরের অনিষ্ট চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য চিন্তা করতে হবে।

ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড মানব জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে অপরিহার্য। বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যেখানে বারবার বলা হয়েছে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার কথা। মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা। তাই বৌদ্ধধর্মের সকল কর্ম ও সকল সাধনা শীলময়, সমাধিময় এবং প্রজ্ঞাময় সম্পর্কযুক্ত। প্রজ্ঞা ও শীল সম্প্রযুক্ত কর্মই কুশলকর্ম। কুশলকর্ম পাপাচার নিবারণ করে মানব জাতিকে ধর্মপালন ও ধর্মাচরণে উৎসাহিত করে।



ধর্ম ও বৃদ্ধেশ প্রেম

বুদ্ধ বলেন, ধর্ম হলো সদ, সুন্দর এবং সম্যকভাবে জীবন যাপনের এক অঙ্গীকার। এজন্য বৌদ্ধধর্মে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি সম্যক পথের কথা স্থীকৃতি পেয়েছে। এ আটটি পথ হলো সদ্দৃষ্টি, সদ্কর্ম, সদ্বাক্য, সদ্জীবিকা, সদ্সংকল্প, সদ্প্রচেষ্টা, সদ্মৃতি ও সদ্সমাধি।

মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক ধরনের দুঃখ চাহিদা থাকেতে পারে। যেমন— ক্ষুধা, দারিদ্র্যা, বিভ-বৈভব ও সম্পদ অর্জনের চিন্তা এবং নানা অভাব অন্টন প্রভৃতি। তাই বলে যে আমি চৌর্যবৃত্তি, দুর্নীতি বা অসদোপায় করে এগুলো মেটাব সেটাতো হতে পারে না। এগুলো লাভের জন্য নিয়ম নীতিও লঙ্ঘন করতে পারি না। ধর্মকে অবলম্বন করে আমরা নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পালন করে থাকি। যেমন: পূজা-পর্বণ, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব, মেলা, বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মকে অবলম্বন করে বৌদ্ধরা ধর্মীয় ও সামাজিক নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম। সর্বজনীনতা মানে সম-অধিকার ও সমমর্যদা। সব মানুষের কর্মশক্তির প্রতিফলন ও সামাজিক মূল্যায়নে বাকস্বাধীনতা, চিন্তা ও মননের স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা থাকতে হবে।

বুদ্ধের এ মুক্তিদর্শন আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণতাসহ জাগতিক সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যতা এনে দেয়। বুদ্ধের প্রথম বাণী ছিল, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য ধর্ম প্রচার করা। এ থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম সর্বজনীন ও মানবতার ধর্ম। বুদ্ধের নীতিবাক্যগুলো বর্তমান সমাজজীবনে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতিবাক্যগুলোর মাধ্যমে মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়।

মানবতা এবং মানবিক গুণাবলির বহিপ্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। বৌদ্ধমতে, বিনয়, দয়া, সত্য, প্রেম, ভালোবাসা-এগুলো মানবিকগুণ। এসব গুণের মধ্যেই আর্দশ জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। এ চরিত্র গঠনের নিমিত্তেই বৌদ্ধধর্মে সব মানুষকে আপন সন্তানের মতো ভাববার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পর্যবসিত করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এবং দয়া, দান ও সেবার প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন হয় সমতা, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণধর্মের। এগুলো একজন মানুষকে করুণাবান ও মৈত্রীবান হতে শেখায়।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

বৌদ্ধরা মৈত্রীপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বুদ্ধের অহিংসানীতি, সংহম ও ঐক্য-সংহতির মন্ত্রে উজ্জীবত। বৌদ্ধরা চিন্তা-চেতনায় ও নীতি লালনে এ নিয়ম অনুসরণ করে। তাই তাঁরা সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট শান্তিকামী মানুষ হিসেবে সমাদৃত এবং আদরনীয়।

নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের সুসম্পর্ক রাখতে হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুসম্পর্কের প্রয়োজন বেশি। এতে বিভিন্ন দেশের সাথে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে। সকল ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়। নানা ক্ষেত্রে উন্নতি-সমৃদ্ধির প্রভাবও বিস্তার শীত করে।

দেশপ্রেম মানব জীবনের অপরিহার্য উপাদান। নিজের দেশকে ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। বৌদ্ধধর্ম নিজের দেশকে ভালোবাসতে শিক্ষা দান করে। তাই দেশপ্রেমে এগিয়ে আসা সকল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের কল্যাণে যে নিবেদিত নয়, সে দেশপ্রেমিক নন। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে যারা কর্ম্ম ও উন্নত জাতি তারা সকলেই নিজ দেশকে



ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম

গভীরভাবে ভালোবাসে। দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করে। যেমন— চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি। স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকতে হবে। দেশের উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্য নিরান্তর ভাবনা থাকতে হবে। দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসার মানবিক গুণ, শ্রম ও মর্যাদা দেখাতে হবে। এগুলোই হলো দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ন্যায়তত্ত্ব হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রকার ন্যায় অধিকার। অর্থাৎ একটি দেশে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে। এখানে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবে না। শ্রেণি স্বার্থ থাকবে না। বৈষয়িক স্বার্থ থাকবে না। এমনকি পদমর্যাদার স্বার্থও থাকবে না। ধর্মের বৈষম্যও এখানে বিচার করা হবে না। ধনী দরিদ্র এবং সব পেশার মানুষ এখানে হবে এক ও অভিন্ন। সব মানুষ তার নিজের মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। বুদ্ধের সময় বৃজি ও বৈশালীবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্য-সংহতির উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্মর্যাদা বলতে নিজের বা স্বীয় মর্যাদাকে বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে আত্মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মর্যাদা যে-কোন ব্যক্তি ও জাতির জন্য মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে আসে।

স্বদেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আত্মর্যাদার অন্যতম গুণাবলী। সুন্দর সমাজ ও জীবন গঠনের জন্যে এ গুণগুলো অতীব প্রয়োজনীয়। মানব জীবনের সকল প্রকার কর্তব্য ও মঙ্গলের জন্য আত্মর্যাদার গুণ প্রভাবিত হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, বহুপ্রকার সত্য জ্ঞান লাভ করতে হবে। বহুবিধ শিল্প শিক্ষা করতে হবে। বিনয়ে সুশিক্ষিত হতে হবে। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

একটি সত্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ শুধু একখণ্ড ভূমির অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরাধীনতার ফ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এছাড়া অন্য জাতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়া। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও জাতি গঠনের সুযোগ লাভ করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা বাঙালি জাতির প্রেরণা রূপে কাজ করে যাবে যুগ যুগ ধরে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

উধৰে ওঠে হাজার বছরের বাঙালির এক্য সংহতি ও সৌভাগ্যের বৰ্খন তৈরি কৱেছে। এতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এ একতা নতুন দেশ গঠনে বাঙালিকে নতুন প্রেরণা দান কৱে।



নানা ধর্ম-বৰ্ণ মানুষসহ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-উল্লাস

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ কৱে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৱে। তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও বৌদ্ধদের অবদান ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধদের অসাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে আরণীয়। বৌদ্ধরা পাকিস্তানাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। ভারতের নানা স্থানে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধরা এই মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দান কৱেছে। বিহার-প্যাগোড়া ও ধর্মশালায়

ধর্ম ও জগন্মহাতাবে

নিরীহ মানুষদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। খাদ্য বস্ত্র দিয়েছে। সাধারণ জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। দেশ বিদেশে স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখেছেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, পণ্ডিত শান্তিপদ মহাথের প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। অন্যদিকে বৌদ্ধ মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে সুপ্রতি রঞ্জন বড়ুয়া, সাধন বড়ুয়া, সুবাস বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বলা যায় বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উভয়ের টিক টিক (✓) দাও :

১. মানব সমাজে কী থাকবে?

- | | |
|------------------------|----------------|
| ক. এক্য-সংহতি | খ. ঝগড়া-বিবাদ |
| গ. পারস্পরিক অসংযোগিতা | ঘ. অসহনশীলতা |

২. মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়—

- | | |
|----------------|---------------------|
| ক. আলস্যতা | খ. দায়িত্ব-কর্তব্য |
| গ. কর্মবিমুখতা | ঘ. দায়িত্বহীনতা |

৩. নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের কী থাকবে?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. ঝগড়া বিবাদ | খ. মনোমালিন্য |
| গ. দুঃসম্পর্ক | ঘ. সুসম্পর্ক |

৪. সব মানুষ তাঁর নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে—

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. ভয়ে ভয়ে | খ. হৈ চৈ করে |
| গ. স্বাধীনভাবে | ঘ. পরাধীনভাবে |

৫. বৌদ্ধধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ক. মানবতা ও মানবিক গুণাবলীর বহির্প্রকাশ | খ. সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যপূর্ণ আচরণ |
| গ. অগণতাত্ত্বিক ও অন্যায্যতা | ঘ. স্বাধীনতাহীন ও বিভেদপূর্ণ আচরণ |

৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধেরা কী করেন ?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ক. অসহযোগিতা করেন | খ. শক্তকে সাহায্য করেন |
| গ. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন | ঘ. স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করেন |

৭. নিজের এবং স্বীয় মর্যাদাকে কী বোঝায় ?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. শ্রম মর্যাদা | খ. জ্ঞান মর্যাদা |
| গ. আত্মমর্যাদা | ঘ. ধর্ম মর্যাদা |

খ। শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে।
২. মানবতা এবং গুণাবলীর বহির্ধারণই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব।
৩. ন্যায়তত্ত্ব হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রতার।
৪. একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে আর কিছু নেই।
৫. বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে।
৬. সর্বজনীনতা মানে সম অধিকার ও।
৭. দেশপ্রেম মানব জীবনে উপাদান।

ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম

গ। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য	১. অশুভ চিন্তায় মেত্রিভাব বিষ্ণিত হয়।
২. স্বদেশপ্রেম, কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ	২. দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
৩. মানুষের সামাজিক জীবনে	৩. অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
৪. বুদ্ধের নীতি বাক্যগুলো	৪. মানব জীবনে অপরিহার্য।
৫. বর্তমান সমাজ জীবনে	৫. অনেক ধরনের দুঃখ ও চাহিদা থাকতে পারে।
৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের	৬. চিন্তা করতে হবে। ৭. আত্মর্যাদার অন্যতম গুণাবলি।

ঘ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ন্যায়তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
২. কতিপয় মানবিক গুণ সম্পর্কে লেখ?
৩. সর্বজনীনতা কী?
৪. আত্মর্যাদা লাভের উপায় কী?
৫. দেশপ্রেম কাকে বলে ?
৬. কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ কর।

ঙ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?
২. আত্মর্যাদা ও সর্বজনীনতা দেশ ও জাতির কী উপকার করে লেখ।
৩. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? এর দু'একটি উদাহরণ দাও।
৪. দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সম্পর্কগুলো তুলে ধর।
৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের ভূমিকা কী ছিল বর্ণনা কর।
৭. আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

দাদশ অধ্যায়

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

যার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়। ভৌগোলিক ভিত্তিতে ভাষা নানা প্রকার হয়, যেমন— সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গা, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ পালি ভাষাতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে এবং পালি ভাষাতে লেখা। সুতরাং ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানতে হলে পালি শব্দের অর্থ, উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

পালি শব্দের অর্থ পাঠ, সারি, পঙ্ক্তি, বীথি বা শ্রেণি। পালি পাঠ সব সময় বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যে ভাষায় বুদ্ধবাণী সংরক্ষিত হয়েছে সেটাই পালি। বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রাবস্তু, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা প্রভৃতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ আছে। এ বিহারগুলোতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারগুলোতে বিভিন্ন ভাষাভাষির লোক সমাগম ও ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হত। এ বিহারগুলোতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয়। পালি ভাষার প্রাচীন নাম হচ্ছে মাগধী। বিশেষ করে উত্তর ভারতে প্রচলিত শব্দ সম্ভারে পালি ভাষা পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে সাহিত্যিক ভাষায় রূপ নেয়।

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। পালি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত। এর উৎপত্তি কাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৮০০ শতক। কেউ কেউ মনে করেন, মাগধী বা মাগধী নিরূপিত থেকে পালি ভাষার উৎপত্তি। আবার কারো কারো মতে, পশ্চিম ভারত কিংবা পূর্ব ভারতই পালির উৎপত্তিস্থল। এ সব অঞ্চলের ভাষা পালি ভাষার সাথে জড়িত। এক সময় উত্তর ভারত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এ সময় পালি ভাষা বা মাগধী ভাষা সমস্ত উত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল।

পালি ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালি সংস্কৃতের চেয়ে সহজ ও শুভিমধুর। বুদ্ধের সময়ে এ ভাষা কথ্য ভাষা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

করেন। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথমে কথা বলতেন। পরে সবারই বোধগম্য একটি সহজ সরল ভাষার সৃষ্টি হয়। এটাই পালি ভাষা। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাথে সমন্বয় সাধনের ফলে এ ভাষা জনসাধারণের অনুধাবণের জন্য সহজতর হয়। বাংলা ভাষার সাথে পালি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পালিভাষার অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা একচালিশ। তন্মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ এবং তেও়িশটি ব্যঙ্গন বর্ণ।

স্বরবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্ফটরূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। পালিতে স্বরবর্ণ আটটি:

অ আ ই ঈ উ উ এ ও

তন্মধ্যে অ ই উ— এ তিনটি ত্রুট্রু স্বর এবং আ ঈ উ এ ও— এ পাঁচটি দীর্ঘস্বর।

ব্যঙ্গনবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ স্বর বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না, তাদেরকে ব্যঙ্গন বর্ণ বলে।

পালিতে ব্যঙ্গন বর্ণ তেও়িশটি:

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ত ম
য র ল ব স
হ ল ং

তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ব্যঙ্গনবর্ণ পাঁচ বর্গে বিভক্ত:

ক খ গ ঘ ঙ	— এ পাঁচটি ক বর্গ	
চ ছ জ ঝ ঞ	— এ পাঁচটি চ বর্গ	বর্গের প্রথম অক্ষর অনুসারে
ট ঠ ড ঢ ণ	— এ পাঁচটি ট বর্গ	বর্গের নামকরণ হয়।
ত থ দ ধ ন	— এ পাঁচটি ত বর্গ	
প ফ ব ত ম	— এ পাঁচটি প বর্গ	

ব্যঙ্গনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। বর্গসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে। বর্গসমূহের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ— এদেরকে ঘোষ বর্ণ বলে।

১ (অং) — এ বর্ণটিকে নিখতিত (নিগ়গহীত) বলে।

এছাড়া বর্ণের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণকে অল্পপ্রাণ বলে।

বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বলা হয়।

অর্থাৎ অল্পপ্রাণ বলতে আস্তে এবং মহাপ্রাণ বলতে জোরে উচ্চারণ করতে হয়।

আবার উচ্চারণ স্থান হিসেবে কঠ, তালু, মুর্দ্ধা, দন্ত বলা হয়।

যেমন— ক খ গ ঘ ঙ অ আ হ— এগুলো উচ্চারণ করলে কঠে আওয়াজ হয়।

তদ্রূপ—

চ ছ জ ঝ ঞ	হ ই ঈ	— কঠবর্ণ	
ণ	ফ ব ত ম	উ উ	— ওষ্ঠ বর্ণ
ট	ঠ ড ঢ ণ	র ল	— মুর্দ্ধা বর্ণ
ত	থ দ ধ ন	ল স	— দন্ত বর্ণ

অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে কঠ, ওষ্ঠ, মুর্দ্ধা এবং দন্ত কাজ করে।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় স্বরের সংখ্যা বেশি। কিন্তু পালি ৮টি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তোমরা মনে রাখবে, বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ঝ, ঝ, ঝ্, ঝু— এ চারটি অক্ষর পালি

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

ভাষায় নেই। আর ব্যঙ্গনবর্ণের শ, ষ, স -এ তিনটির মধ্যে শুধু ‘স’ এর ব্যবহার আছে। ড়, ঢ -এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এছাড়া পালিতে ‘(রেফ), : (বিসর্গ), ৰ (খ-ফল) নেই।

এ সম্পর্কে তোমাদের পুরো ধারণা থাকলে পালি শব্দ গঠন সহজতর হবে। পালি বাংলার সম্পর্ক বেশি। কারণ, বাংলা ভাষার উৎপত্তি পালি ভাষা থেকেই। চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি।

তোমাদের সুবিধার জন্য নিম্নে পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

পালি	বাংলা
অঞ্জলি	অঞ্জলি
সংওয়	সংওয়
কণ্টক	কণ্টক
পণ্য	পণ্য
উত্তম	উত্তম
উত্তর	উত্তর
আহার	আহার
বুদ্ধি	বুদ্ধি
স্বাগত	স্বাগত
কৃষ্টার	কৃষ্টার
কোকিল	কোকিল
কল্যাণ	কল্যাণ

তোমাদের বর্তমান পাঠ্যপুস্তক ‘বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা’র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ক্ষেত্রে, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা, চতুর্থ অধ্যায়ের দশশীল পালিতে দেখা আছে। তোমরা লক্ষ্য করবে, পালি উদ্ধৃতির কোথাও খ, খ্, ৱ, ঐ, ঔ, ‘(রেফ), : (বিসর্গ) নেই।

সুতরাং দেখা যায়, ভাষার দিক দিয়ে পালির বেশ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালির শব্দগত বৈশিষ্ট্য সহজে অনুমান করা যায়। শুধু ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্রিয়ত পার্থক্য আছে। তবে অন্যান্য ভাষার চেয়ে অনেকটা সহজ।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও :

১. ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর আছে?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. দুটি | খ. তিনিটি |
| গ. চারটি | ঘ. পাঁচটি |

২. পাণি কোন আর্যভাষার অন্তর্গত?

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ক. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা | খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা |
| গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা | ঘ. ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষা |

৩. বুদ্ধের ধর্মবাণী কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

- | | |
|--------------|-------------------|
| ক. গীতায় | খ. বাইবেলে |
| গ. ত্রিপিটকে | ঘ. বৈদিক শাস্ত্রে |

৪. উত্তর ভারত কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- | | |
|------------|----------|
| ক. মগধ | খ. বিহার |
| গ. পাঞ্জাব | ঘ. কোশল |

৫. পাণিতে স্বরবর্ণ কয়টি?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১১টি | খ. ১০টি |
| গ. ৮টি | ঘ. ৭টি |

৬. বাঙ্গা ভাষার আদি নির্দশন কোনটি?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. প্রাকৃত | খ. অর্ধ মাগধী |
| গ. অপভ্রংশ | ঘ. চর্যাপদ |

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন সংমিশ্রণ আছে।
২. যে ভাষায় বুদ্ধবাণী হয়েছে সেটাই পাণি।
৩. এক সময় উত্তর ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

৪. এ বিহারগুলোতে পালি ভাষার হয়।
৫. পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে ভাষার রূপ নেয়।
৬. বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে বলা হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
<ol style="list-style-type: none"> ১. ঠাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী ২. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন ৩. এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়ে ৪. এসব অঞ্চলের ভাষা পালির সাথে ৫. আ ই উ এ ও— ৬. সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় 	<ol style="list-style-type: none"> ১. বাংলার সম্রক্ষ পালির বেশি। ২. ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ৩. এ পাঁচটি দীর্ঘস্মর। ৪. স্বরের সংখ্যা বেশি। ৫. ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে। ৬. জাতির সংমিশ্রণ আছে। ৭. উচ্চারণে কোন প্রভেদ নেই।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর কী কী?
২. প্রাচীন ভারতের চারটি বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখ।
৩. পালি ভাষায় অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা কত?
৪. পালি স্বরবর্ণে কোন বর্ণ গুলো ব্যবহার হয় না?
৫. অল্পপ্রাণ বলতে কী বুঝা?
৬. পালিতে ব্যঙ্গন বর্ণ কয়টি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে লেখ।
২. পালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য আলোচন কর।
৩. পালিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঙ্গন বর্ণ কয়টি ও কী কী?
৪. প্রথম পঁচিশটি পালি বর্ণের পাঁচটি বিভক্তকরণ দেখাও।
৫. পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের বারোটি শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর।
৬. পালি বর্ণমালা সম্পর্কে একটি ধারণা দাও।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫-বো

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু -জাতক



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত—বিক্রয়ের জন্য নয়।